লা মিজার‍্যাবল্‌

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
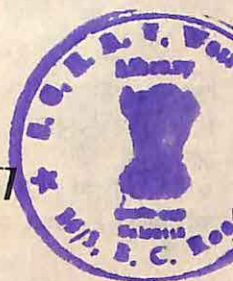
অনুবাদ সিরিজ

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌

● ভিক্টর মারি হ্যুগো ●

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

উপহার

লোহা-বাঁধানো লাঠির ওপর ভর রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

লেখক-পরিচিতি
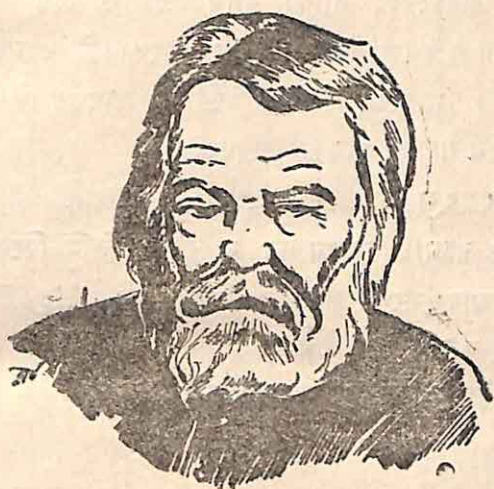
বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল মহামনীষী ভিক্টর-মারি হ্যুগোর জন্ম হয় ফরাসী দেশে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি, ততোধিক অনুরাগ ছিল সমাজের সর্বস্তরে মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের দিকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি যে অনবদ্য সাহিত্য মঞ্জুষা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, তা শুধু ফরাসী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে নি, যুগ যুগ ধরে সাহিত্য-রসিক সমাজকে এক সুমহান আদর্শবাদের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

হ্যুগোর বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ মানবের ভেতরে অতি-মানবতার উন্মেষ সাধন। সামান্য সূচনা থেকে যেভাবে এর বিকাশ তিনি ফুটিয়ে তোলেন সংঘাত ও বিবর্তনের মাধ্যমে, তা শুধু মহত্তম স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। দীনতম পরিবেশের ভেতর নরদেবতার আবির্ভাব যে সচরাচরই ঘটে থাকে, তাই যেন হ্যুগো-সাহিত্যের চরম

প্রতিপাদ্য। জাঁ ভ্যালজাঁ, গেলিয়াট, কোয়াসিমোডো প্রভৃতি চরিত্র ওই আবির্ভাবের দরুনই ধন্য হয়েছে, অমরত্ব লাভ করেছে।

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌, হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম, টয়লার্স অব দি সী, নাইনটি থ্রী, ক্রমওয়েল, লাফিং ম্যান প্রভৃতি গ্রন্থ মানবজাতির চিরন্তন সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি রচনাই রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। মানুষের ভেতর যতদিন অমৃতের পিপাসা বর্তমান থাকবে, ততদিন সমাদর থাকবে এদের।

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌ উপন্যাস হ্যুগোর এক অমর কীর্তি। হ্যুগো শুধু উপন্যাস রচনাই করেন নি, নাটকেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য বলিষ্ঠ আদর্শবাদের আলোক বিচ্ছুরণ করে তাঁর উপন্যাসগুলিই অর্জন করেছে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যু হয়।

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌

ফরাসী দেশের ছোট্ট একটি শহর—লা-ব্রিয়ে।

সেইখানে বাস করে এক গরিব কাঠুরে—তার নাম জাঁ ভ্যালজাঁ। লম্বা খুব বেশী নয়, কিন্তু ঘাড় আর বুক তার অসম্ভব চওড়া। দেহের পেশী এক একটা যেন লোহার ডাণ্ডা।

দৈত্যের মত শক্তি ভ্যালজাঁর দেহে।

শক্তির তার দরকারও আছে। উদয়াস্ত কাঠ চেরাই তার ব্যবসা। তারই উপার্জনে অতবড় সংসারটা তাকে প্রতিপালন করতে হয়।

বিধবা দিদির সাত সাতটি ছেলেমেয়েকে পুষতে হয় ভ্যালজাঁকে। দিদি তো আছেনই। এই দিদির হাতেই ভ্যালজাঁ একদিন মানুষ হয়েছিল, কারণ শৈশবে জ্ঞান হয়ে অবধি বাবা-মাকে সে দেখেনি কোনদিন।

সাতটি শিশু—সবচেয়ে বড়টির বয়স বছর বারো। সবচেয়ে ছোটটির এখনো কথা ফোটেনি। ভগিনীপতিটা টপ্‌ করে মরে গেল, দারুণ শীতে বুকে ঠাণ্ডা বসে। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স তখন ভ্যালজাঁর। দায়-ঝক্কি তার মাথায় কিছু ছিল না তখনও। হঠাৎ ষোল আনা ঝক্কি এসে চেপে ধরল যখন, সে কিন্তু মুষড়ে পড়ল না। কুড়োলখানা কাঁধে নিয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

ওই কুড়োলই সাতটা বাচ্চাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই থেকে। ভ্যালজাঁর কাজের অভাব হয় না। তার শক্তিও যেমন, নিষ্ঠাও তেমনি। যত শক্ত কাঠই হোক, ভ্যালজাঁ চিরতে

ভয় পায় না। যতক্ষণই একটানা খাটতে হোক, কাজে ফাঁকিও দেয় না। তাই শহরের লোক খোঁজে তাকে। ডেকে এনে কাজ দেয়।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। এবার ভ্যালজাঁরও কাজের অভাব হয়েছে। শীতের আগেই একটা গুজব উঠেছিল বিদেশী কারা শহরের আশেপাশের সব জঙ্গল কিনে নিয়েছে। গাছ কিনতে পাওয়া যাবে না শীতকালে। সবাই ব্যস্ত হয়ে আগে ভাগে কাঠের যোগাড় করে ফেলেছিল। গুঁড়ি কিনে, চেরাই করিয়ে গোলাজাত করেছিল জ্বালানী কাঠ, যাতে জমাট শীতের দিনে জমে যেতে না হয়।

সে-মরসুমে জাঁ ভ্যালজাঁরও রোজগার হয়েছিল বেশী বেশী। কিন্তু গরিবের মহলে সঞ্চয়ের রেওয়াজ নেই। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। জাঁর দিদি দিনকতক ভালমন্দ খাইয়েছিল ছেলেমেয়েদের। এই পর্যন্ত।

তার ফল ভুগতে হচ্ছে এখন। শীতের লাকড়ি সকলের ঘরেই মজুদ, এখন আর চেরাই করাবার দরকার নেই কারও। কুড়োল কাঁধে নিয়ে জাঁ দোরে দোরে ঘোরে। ফিরে আসতে হয় প্রতি দরজা থেকেই। "না ভাই, এখন নয়।" "না হে ভ্যালজাঁ, আর কাঠ রাখব কোথায়? তুমি সেই মে মাসে এসো।"

একটা সাউ রোজগার হয় না আজ তিন দিন। একটুকরো রুটি নেই ঘরে কাল থেকে। বাচ্চাগুলো শুকিয়ে আছে। ভোরে বেরিয়ে আসবার সময়েই জাঁর কানে গিয়েছিল তাদের খিদের কান্না। বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে সে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তবু সেই কান্না যেন এখনও তার কানে এসে ঢুকছে ক্রমাগত, আগের চাইতেও জোরালো আর ধারালো হয়ে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরা জাঁর রীতি। কাঁধে থাকে কুড়োল, হাতে থাকে রুটি, মাংস, মটর, বাঁধাকপির টুকরো। খাদ্যগুলি দিদির হাতে গছিয়ে দিয়ে সে বাচ্চাদের ঘাড়ে

পিঠে কোলে তুলে নেয়। তারা কেউ লাফায়, কেউ চেঁচায়, কেউ ক্ষুদে ক্ষুদে হাতে চাপড় মারে মামার লোহার অঙ্গে।

আজ কিন্তু জঁা বাড়ি ফিরতে পারছে না।

সন্ধ্যা হল। বাচ্চারা কাল থেকে খায়নি কিছু। শুধু হাতে সে কেমন করে বাড়ি ফিরবে?

বরফ পড়ছে। রাস্তায় আলো অতি ঢিমে। জায়গায় জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। সেইরকম একটা জায়গায় একটা গাঢ়তর অন্ধকারের পাঁজা। সেই পাঁজাটাই জঁা ভ্যালজঁা। সে বাড়ি ফিরতে পারছে না।

এক রুটিওয়ালা দোকানের ভেতর নিজের খাবার তৈরি করছে। আজকের মত কেনাবেচার পালা শেষ হয়ে গেছে তার। অন্ধকার রাতে বরফ মাথায় করে আজ আর কোন খদ্দের আসছে না রুটি কিনতে।

তবু বাইরের আলোটা এখনও জ্বেলে রেখেছে দোকানী। বন্ধ করার বাঁধা সময় আছে তো একটা! তার আগে আলো নেবানো যায় না, তা বাইরে যত বরফই পড়ুক।

ভেতরে বসে ডেকচিতে শুরুয়া জ্বাল দিচ্ছে রুটিওয়ালা, মাংসটা আধা-আধি সিদ্ধ হলেই সে খানায় বসে যেতে পারে। আধা-সিদ্ধ মাংসই সে খেয়ে থাকে। শুধু সে কেন, অধিকাংশ গরিব লোকই। দাঁত যতদিন আছে, ততদিন মাংস পুরোপুরি সিদ্ধ করবার দরকার কী?

চামচ দিয়ে মাংসে একটা নাড়া দিতে গিয়েই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল দোকানী। ঝন-ঝন-ঝনাৎ! কাঁচ ভাঙল না? তারই দোকানের কাঁচ না? খোলা জানালায় কাচের আলমারিতে রুটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে—

শব্দ শোনার সাথে সাথেই সে বাইরে দৌড়েছে। যা ভেবেছে, তাই! ওই যে একটা লোক ছুটে পালায়। এই যে আলমারির কাচ ভাঙা!

'চোর, চোর' বলে দোকানী ছুটতে শুরু করল। যে-রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না একটু আগে, চোখের পলকে মানুষ যেন গজিয়ে উঠল সেখানে। এ-দরজা থেকে একজন বেরুচ্ছে ও-মোড় থেকে একজন দেখা দিচ্ছে—আর 'চোর, চোর' বলে সবাই ছুটছে জাঁ ভালজাঁর পেছনে।

ধরা পড়ে গেল জাঁ। তখনও তার হাতে চোরাই রুটি।

দরজা ভেঙ্গে চুরি? অপরাধ গুরুতর। ফরাসী দেশের আইন-কানুন তখন খুব কড়া। বিচারে পাঁচ বছর জেল হল জাঁর। জেল বলতে কিন্তু চার দেয়ালের ভেতর কারাবাস নয়। খোলা সমুদ্রে জাহাজ চলছে, সেই জাহাজে শিকলে-বাঁধা অবস্থায় কাটাতে হবে পাঁচ বছর, বাঁধা অবস্থাতেই বসে বসে জাহাজের দাঁড় টানতে হবে। তখন জাহাজ বাষ্পের সাহায্যে চলত না। চলত পাল তুলে বা দাঁড় টেনে।

তুলোঁ বন্দরে পাঠানো হল জাঁকে এবং আরও অনেক কয়েদীকে। খোলা লম্বা ঘোড়ার গাড়িতে সারি সারি কয়েদী বসে আছে, শিকল দিয়ে গাড়ির সঙ্গে আটকানো। দীর্ঘ সাতাশ দিনের পথ তুলোঁ।

গাড়িতে তোলবার আগে কয়েদীরা পাথরে-বাঁধানো উঠোনে বসে আছে, হাত পা শিকলে বাঁধা। সেই শিকল-বাঁধা হাত একবার ওপরে তুলছে জাঁ, একবার নীচে নামাচ্ছে। ধাপে ধাপে নামাচ্ছে—দুহাত উঁচুতে, পৌনে দু-হাত উঁচুতে, দেড় হাত উঁচুতে—নামতে নামতে প্রায় মাটির ওপরে নেমে এল হাত। দু'চোখ বেয়ে ধারা গড়াচ্ছে, আর সাত সাতটি অসহায় শিশুর মাথার খাড়াই সে মেপে মেপে দেখাচ্ছে—

কাকে দেখাচ্ছে? ভগবানকে বোধ হয়।

* * * *

তুলোঁতে নিয়ে জাহাজের ওপর বসিয়ে দেওয়া হল জাঁকে, জলের ধার ঘেঁষে। তার সামনে কয়েদী, পেছনে কয়েদী। কয়েদীর

লাইন। যত কয়েদী বসবে দাঁড় দিয়ে, যত জোরে দাঁড় টানবে তারা, জাহাজ তত জোরে চলবে।

দিনের পর দিন দাঁড় টানছে জাঁ ভ্যালজাঁ—তিন বছর কেটে গেল এই ভাবে। কাঠের তক্তায় শোয়া, মানুষের যা অখাদ্য তাই খাওয়া। উঠতে বসতে চাবুক মারছে তত্ত্বাবধায়কেরা। যখন মারছে না, তখনও অবিরাম গালি-গালাজ করছে। আর সে-গালির কী ভাষা! মানুষ মানুষের প্রতি সে-ভাষা ব্যবহার করতে পারে, এমন কেউ কল্পনা করতেও পারবে না।

তত্ত্বাবধায়কেরাও এ-ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জা পেত, যদি কয়েদীদের মানুষ বলে মনে করত তারা। কয়েদী—সে তো কয়েদীই। তার একমাত্র পরিচয় এই যে সে কয়েদী। কয়েদীও যে মানুষ, মানুষের মতই যে তার হৃদয় আছে, চিন্তা করবার শক্তি আছে, মান অপমান সুখ দুঃখ বোধ আছে, একথা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক্ হয়ে যেত যে কোন তত্ত্বাবধায়ক। কয়েদী—সে তো একটা সংখ্যা মাত্র! জাঁ ভ্যালজাঁরও একটা সংখ্যা আছে—২৪৬০১। নাম ধরে কেউ তাকে ডাকে না, বা তার কথা উল্লেখ করে না। ডাকে ২৪৬০১ বলে। ২৪৬০১-কে দশ ঘা চাবুক মারো! ২৪৬০১-এর জন্য পোড়া রুটি বরাদ্দ হল তিন দিনের জন্য, বদমেজাজ দেখাবার দরুন। ইত্যাদি—

পশুর মত ব্যবহার পেতে পেতে জাঁ নিজেই ক্রমশঃ ভুলে গেল যে সে একদিন মানুষ ছিল। অন্যেরা তাকে পশু মনে করে, নিজেও সে নিজেকে পশু মনে করতে লাগল।

একটা প্রবল আকর্ষণ তার স্বাধীন জীবনের ওপরে। সব কয়েদীরই এ-আকর্ষণ থাকে। জাঁর মনের এবং দেহের জোর অদম্য, কাজেই তার এই আকর্ষণও অদম্য। একবার যদি পালানো যেত! একবার যদি দেখে আসা যেত যে সাতটা পরিত্যক্ত শিশু সবাই না-খেয়ে মারা পড়েছে, না এখনও দু একটা বেঁচে আছে! আঃ, একটিবার যদি পালানো সম্ভব হত!

সত্যি সত্যি পালানো সম্ভব নয়, কিন্তু পালানোর চেষ্টা করাটা সব সময়েই সম্ভব। এ-চেষ্টা অনেক কয়েদীই করে থাকে, সফল হয় কদাচিৎ এক আধজন। জঁা ভ্যালজঁাও চেষ্টা করল, জাহাজ থেকে, বন্দর থেকে, শহর ছাড়িয়েও দূরে পালাতে সক্ষম হল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ক্ষুধার জন্য। লুকিয়ে বেড়াতে হলে খাবার সংগ্রহ করা শক্ত। তিন দিন উপোষ দেওয়ার পরে সে আবার ধরা পড়ে গেল ওই খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই।

কয়েদীর পক্ষে জেল-পালানোর অপরাধ যারপরনাই মারাত্মক। এ-অপরাধের বিচার হল ভ্যালজঁার এবং নতুন করে কারাদণ্ড হল তার আরও তিন বছর। ছিল পাঁচ, হল আট।

আট বছরও প্রায় শেষ হয়ে এল যখন, ভাগ্যদেবতা আবারও নির্মম পরিহাস খেললেন তার সঙ্গে। আবার পালাবার প্রলোভন এনে খাড়া করলেন তার সামনে। সুযোগ পেতেই জঁা পালাল, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে গেল আবার। এবারে সাজা হল আরও পাঁচ বছর।

বার বার বারবার জঁা পালাল, চারবারই পড়ল ধরা। ফলে পাঁচ বছরের মেয়াদটা মোট উনিশ বছরে গিয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে, উনিশ বছর ধরে জাহাজের দাঁড় টানবার পর একদিন জঁা ভ্যালজঁা সত্যিই মুক্তি পেল। প্রথমে তো তার বিশ্বাসই হতে চায় না যে সত্যিই সে পেয়েছে মুক্তি। কারাধ্যক্ষ যখন এসে বলল—"তুমি খালাস", তখন সে ভাবল এ শুধু একটা নিষ্ঠুর পরিহাস কারাধ্যক্ষের।

কিন্তু সত্যই তাকে বিশ্বাস করতে হল শেষ পর্যন্ত যে প্রকৃতই সে মুক্তি লাভ করেছে এবার। সবাইয়ের সামনে দিয়ে সে যখন বেরিয়ে গেল, তখন বাধা দিল না কেউ।

যখন কারাগারে ঢুকেছিল, তখন তার বয়স সাতাশ বছর, আজ সে ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। কিন্তু বয়স যতই হোক, দেহের শক্তি

তার এক তিল কমেনি। বরং যেন প্রথম যৌবনের চাইতেও বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি। শক্তি এবং শক্তিপ্রকাশের কসরত। খাড়া দেয়ালের গায়ে একটুখানি ভাঁজ বা কোণ যদি সে পায়, তরতর করে সেই দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারে কাঠবিড়ালীর মত। বোঝাই গাড়ি কাদায় পড়ে গিয়েছে, বকযন্ত্র ছাড়া তাকে টেনে তোলবার কোন উপায় নেই, জাঁ ভ্যালজাঁ সেই গাড়ির তলায় ঢুকে পিঠের চাড় দিয়েই উঁচু করে তুলতে পারে গাড়িখানা।

সবাই জানে দৈত্যের মত শক্তিধর এই জাঁ ভ্যালজাঁ। সবাই বলাবলি করে—জাঁ ভ্যালজাঁর মত বলবান লোক ফরাসী দেশে আর নেই।

এ-হেন জাঁ ভ্যালজাঁ কারামুক্ত হল—পকেটে একশো নয় ফ্রাংক নিয়ে। উনিশ বছরে এই অর্থটার পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল একশো একাত্তর ফ্রাংক। কী কারণে যে সেটা এত কমে গেল, তার একটা হিসাব দিয়েছিল কারাধ্যক্ষ, কিন্তু সে-হিসাব বুঝতে পারে নি ভ্যালজাঁ। স্বভাবতঃই তার মনে হয়েছে যে তাকে ঠকানো হল।

পকেটে তার একশো নয় ফ্রাংক, এবং হলদে রঙের ছাড়পত্র।

নিজের এলাকা ছেড়ে একটু দূরের গ্রামে বা শহরে যেতে হলেই সেযুগে ফরাসী দেশের লোককে সঙ্গে রাখতে হত পরিচয়পত্র। সরকারী কোন কর্মচারীর সহিমোহর থাকত তাতে। সাধারণ নাগরিকদের পরিচয়পত্র হত সাদা রঙের, শুধু কয়েদীরা কারামুক্ত হয়ে বেরুতো যখন, তাদের হাতে দেওয়া হত হলদে রঙের কাগজ একখানা। এর ফলে যেখানেই সে যাবে, লোক সহজেই জানতে পারবে যে এই লোকটা জেল খেটে এসেছে। এ একটা বিপজ্জনক লোক।

তুলোঁ থেকে বেরিয়েই সে সাতাশ দিনের রাস্তা নিজের গ্রাম লা-ব্রিয়ের পথ ধরল। সেখানে গিয়ে সে কী দেখবার আশা করছে? কিছু না। তার মনই তাকে বলে দিয়েছে—নেই, নেই কেউ নেই।

দিদি নেই, ভাগনেরা নেই, ভাগনীরাও নেই। এতটুকুন এতটুকুন যে সাতটা শিশুকে সে অনশনের মুখে ফেলে এসেছিল, তারা অনশনেই মারা গিয়েছে অনেকদিন আগে। গিয়ে হয়ত তাদের সে কুঁড়েখানার কোন চিহ্নও কোথাও সে দেখতে পাবে না।

তবু যেতে হবে একবার। লা-ব্রিয়েতে একবার না গিয়ে সে পারবে না। যদি তাদের কবরগুলোও খুঁজে পাওয়া যায়, একবার সেখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে চোখের জলও তাকে ফেলে আসতে হবে।

পথে পড়ে ছোট্ট শহর—গ্রাস্।

গুদামের সামনে বোঝাই গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, কয়েকটা মুটে আড়াই-মণ ওজনের সব বস্তা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। জঁা ভ্যালজঁা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "আমায় কাজ দেবে?" পকেটের একশো নয় ফ্রাংক সে খরচ করতে চায় না।

গুদামের মালিক তাকিয়ে দেখল, তার চওড়া কাঁধ আর চওড়া বুকের দিকে। ইশারায় বলল—"লেগে যাও কাজে।"

যে বস্তা তিনজন মুটে ধরাধরি করে নামাতে পারছে না, জঁা তা এক ঝটকায় গাড়ি থেকে টেনে তুলল। আর পিঠের ওপর ফেলে, প্রায় সোজা পায়ে হেঁটে গুদামের ভেতর ঢুকে গেল।

অন্য মজুরেরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল প্রথমে, তারপরে হিংসায় জ্বলতে লাগল। এ-লোক যদি গ্রাস্ শহরে কায়েমী হয়ে থেকে যায়, তাহলে তাদের তো অন্ন উঠল!

"কে হে লোকটা? কোথাকার হে?" চারদিকে গুঞ্জন উঠল একটা।

একটা পুলিসের লোক যায় পাশ দিয়ে। গুঞ্জন শুনে সে গিয়ে জঁাকে বলল, "তোমার কাগজপত্তর দেখি!"

বাধ্য হয়ে জঁাকে বার করতে হল তার হলদে ছাড়পত্র।

উলটেপালটে ছাড়পত্র পরীক্ষা করল সার্জেন্ট, উঁচু করে দেখালও

মুটেদের, তারপর জঁার দিকে একটা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের কাজে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা মুটেদের বিদায় করছে মালিক মাথা-পিছু ত্রিশ সাউ দিয়ে। জঁার পালা এল সব শেষে, তার হাতে দিল পনেরো সাউ।

জঁা অবাক্ হয়ে বলল—"অন্যে পেলো ত্রিশ, আর যে কোন তিনজনের সমান কাজ করে আমি পাবো পনেরো ?"

"তোমার পক্ষে পনেরোই বেশী।"—মুখ মুচকে জবাব দিল মালিক।

ইঙ্গিতটা বুঝল জঁা। বেশী দাবি করলে তা পাওয়া তো যাবেই না, পরন্তু মালিক পুলিস ডেকে একটা যা-হোক-কিছু মিথ্যা নালিশ করে ওকে কয়েদখানায় পাঠাবে। উনিশ বছর জেল-খাটা দাগী কয়েদীকে বিপদে ফেলা তো একটা তুড়ির ব্যাপার !

বেত-খাওয়া কুকুরের মত মাথা নীচু করে জঁাকে বিদায় হতে হল সেই পনেরো সাউ নিয়ে। মানুষের ওপর তার অশ্রদ্ধা আরও একটু গভীর হল।

অন্যায় শুধু সে-ই করেনি। যারা জেল খাটেনি, তারাও কেউ কেউ অন্যায় করে, নিষ্ঠুরতা করে, ফাঁকি দেয় প্রতিবেশীকে।

সারা রাত সারা দিন সে পথই চলল। খাওয়া-দাওয়ার জন্য হোটেলের চেষ্টাও করল না। গ্রাস্ থেকে কিছু খাদ্য যোগাড় করে নিয়েছিল, পথে যেতে যেতে তাই চিবুলো মাঝে মাঝে। যত শীঘ্র সম্ভব, সে লা-ব্রিয়েতে পৌঁছোতে চায়।

সন্ধ্যার আগে পৌঁছোলো ডি' শহরে। খুব ছোট শহর নয়, একজন বিশপ আছেন পর্যন্ত।

জঁার পা আর চলে না। সারা দিনে ছত্রিশ মাইল হেঁটে এসেছে একরকম অনাহারেই। কিছু খেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে না পারলে আর এক মাইলও সে হাঁটতে পারবে না।

পকেটে পয়সা আছে, আহার-নিদ্রার পক্ষে অসুবিধা হওয়ার

কোন কারণ নেই। ডি' শহরে ছোট-বড় হোটেল আছে অনেক। যে কোন একটাতে ঢুকে পড়লেই হল।

সামনেই ল্যবেয়ারের হোটেল। বেশ সাজানো-গোছানো আলো-ঝলমল দোকান। ওপরে ঘরও দেখা যায় অনেকগুলি। অবশ্যই ওগুলি পথিকদের শোবার ঘর। আহার ও বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল জ্যঁ।

মালিক বসে ছিল হিসাবের টেবিলে। একটা নোংরা, দুশমন-চেহারার লোককে ঝোলা কাঁধে, মোটা লাঠি হাতে হোটেলে ঢুকতে দেখেই সে সংশয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল!

জ্যঁ দাঁড়িয়ে পড়ে কপালের ঘাম মুছল একটিবার। তারপর বলল—"কিছু খাবার আর রাতের জন্য একটা বিছানা পাওয়া যাবে কি?"

বিরসকণ্ঠে হোটেলওয়ালা উত্তর দিল—"পয়সা দিলেই পাওয়া যাবে।"

"পয়সা আছে বইকি!"

"তাহলে বসে পড়। খাবার তৈরী হবে এক্ষুনি।"

জ্যঁ আগুনের দিকে পিঠ করে বসল। হোটেলওয়ালা হিসেব মেলাচ্ছে, আর ঘন ঘন মুখ তুলে তুলে তার দিকে তাকাচ্ছে। একটা গুজব সে শুনেছে আজ সকালে যে তুলোঁ থেকে এক দাগী কয়েদী এই পথ ধরে এদিকে আসছে। গুজবটা রটেছে গ্রাস্ শহরের সেই পুলিস-সার্জেন্টের কৃপায়। যে-সব পর্যটক ঘোড়ার ডাকগাড়িতে এসেছেন গ্রাস্ থেকে ডি'-তে, তাঁরাই মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছেন গুজব। কয়েদীটার বর্ণনাও পেয়ে গেছে ডি'-র লোকেরা।

দেখতে দেখতে সরাইওয়ালার মনের সন্দেহ ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠছে। অবশেষে এক চিরকুট কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সে তাতে কী যেন লিখে ফেলল চটপট। তারপর ইশারায় ডাকল তার বালক-ভৃত্যকে। সে তখন ব্যস্ত ছিল টেবিল পরিষ্কার করা আর বাসন ধোয়া

নিয়ে। নোংরা হাতেই উঠে এল মনিবের কাছে। মনিব কাগজের টুকরোটা তার হাতে দিয়ে কানে কানে তাকে কী বলল যেন।

বেরিয়ে গেল ছেলেটা হাত না ধুয়েই। জাঁ ভ্যালজাঁ আগুন-পিঠ করে বসে আছে, এসব কিছুই দেখল না।

বেশী দূর গেল না ছেলেটা। বড় রাস্তার মোড়েই একটা বড় বাড়িতে ঢুকল। সেটা মেয়রের বাড়ি। সেখান থেকে সে বেরিয়ে এল কয়েক মিনিটের ভেতরেই। ফিরে এল হোটেলে। সেই চিরকুটখানাই ফেরত দিল মালিকের হাতে। সে সাগ্রহে দেখল তার উলটো পিঠে কী-যেন লিখে দিয়েছে বড় বাড়ির লোকেরা।

একবার সে ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আনল। খরিদ্দারেরা বিভিন্ন টেবিলে বসে খাবার পরিবেশনের অপেক্ষা করছে। তারা কি আভাস পেয়েছে কিছু? হয়ত পেয়েছে। ছেলেটার চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাওয়া এবং চুপিসাড়ে ফিরে আসা সকলেরই যে নজর এড়িয়ে গিয়েছে, তা নয়। কেউ কেউ চোখ তুলে সাগ্রহে মালিকের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

মালিক গিয়ে পেছন থেকে জাঁর পিঠের ওপর হাত রাখল। সে ফিরে তাকিয়ে বলল—"কী? খাবার তৈরী? এখানে বসে খাওয়া যাবে না নাকি?"

"খাবার নেই"—দাঁতের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা কথা বেরিয়ে এল, সাপের হিসহিসানির মত।

"খাবার নেই? ওই যে ডেকচি-ভরা খাবার উনুনে বসানো আছে?"—অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল জাঁ।

"ওই খাবার? ওসব ফরমাস-দেওয়া খাবার। ওসব ভদ্রলোকের চাহিদা-মত তৈরী হয়েছে! ও থেকে এক টুকরোও বাইরে কাউকে দেওয়া যাবে না।"

"নেহাত বাজে কথা।" জাঁ রেগে বলল—"একটু আগে তাহলে তুমি বললে কেন যে এখানে খেতে আর শুতে পাওয়া যাবে?

তুমি কি ভাবছ যে আমি দাম দিতে পারব না ? তাহলে বরং আমি আগাম দাম দিয়ে দিচ্ছি। বল, কত দিতে হবে।"

"কিছুই দিতে হবে না"—দাঁতে দাঁত ঘসে সরাইওয়ালা বলল—"তুমি খেতেও পাবে না, শুতেও পাবে না, দামও তোমায় দিতে হবে না। তুমি ওঠো এখান থেকে।"

"এ কী রকম ব্যবহার ?" জাঁ উত্তেজিত হয়ে উঠল—"এটা তো হোটেল, না কি ? আমি পয়সা দেব, খেতে পাব না কেন ? আমি বলছি, দুদিন আমার পেটে কিছু যায়নি। না খেয়ে আমি নড়ব না এখান থেকে।"

"না খেয়ে নড়বে না ? তাহলে তোমার নামটা বলে দিই এই সব ভদ্রলোককে ? শুনুন মহাশয়রা, এঁর নাম জাঁ ভ্যালজাঁ। উনিশ বছর কয়েদ খেটে ইনি এই কয়েক দিন আগে খালাস পেয়েছেন! এঁকে কি আপনাদের টেবিলে বসে খাওয়ার জন্য আপনারা নিমন্ত্রণ করবেন ?"

একটা টিটকারি, তারপর একটা অট্টহাস্য। তারপর বহু জোড়া চোখের সকৌতুক সভয় দৃষ্টি জাঁ-এর ওপর নিবদ্ধ হল। যেন বন্য হিংস্র পশু একটা হঠাৎ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জাঁকে উঠতে হল। পেটে আগুন জ্বলছে। টেবিলে সুঘ্রাণ খাদ্য, পকেটে পয়সা, তবু খাওয়ার অধিকার নেই তার।

পা টলছে, তবু সে হেঁটে চলে গেল ডি' শহরের ও-মাথায়। সেখানে একটা খুব ছোট্ট সরাই। ভাল খাবার এরা রাখে না, গরিব মুটে মজুর লোকেরাই এখানকার খরিদ্দার। সরাইওয়ালা জাঁকে বসতে বলল ভদ্রভাবেই। কিন্তু হায় রে! ল্যাবেয়ারের হোটেল থেকে এই মাত্রই একটি লোক এসে এ হোটেলে ঢুকেছে। সে সরাইওয়ালাকে কানে কানে জাঁর পরিচয় জানিয়ে দিল। উঠতে হল জাঁকে এখান থেকেও।

বড় ছোট এক ডজন হোটেল থেকে গলা-ধাক্কা খেয়ে অভুক্ত জাঁ

শুধু একটু ঘুমোবার জন্য এক আস্তাবলের ভেতর ঢুকল। অমনি এক খেঁকী কুকুর তাকে দিল খ্যাঁক করে কামড়ে। মানুষেরই আচরণের অনুকরণ করছে এই অবোধ জানোয়ার। তার দোষ কী!

দুই

ডি'শহর একদিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য। একজন বিশপ আছেন এখানে। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে খ্রীষ্টধর্মচক্রের সর্বময় নিয়ন্তা এই বিশপ। যত যাজক আছেন এ অঞ্চলে, এই বিশপের নির্দেশেই তাঁদের চলতে হয়।

বিশপের নাম বেনভেনুটো মীরিয়েল।

বড় ঘরের ছেলে মীরিয়েল, যৌবনে নাকি অন্য পাঁচজন অভিজাত তরুণের মতই বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। যুদ্ধেও গিয়েছিলেন একবার। তারপর সৈন্যদল ছেড়ে ইতালিতে যান এবং দীর্ঘদিন সেই দেশে বাস করেন। অবশেষে যখন তিনি ফিরে এলেন ফ্রান্সে, তখন দেখা গেল তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেছেন এবং তার জীবনের গতিপ্রকৃতি আমূল পালটে গিয়েছে।

তাঁর পূত সংযত চরিত্রের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তেই ধাপে ধাপে তাঁর পদোন্নতি হল ধর্মচক্রের ভেতর। এই সময়ে তিনি ডি' শহরের বিশপ।

দান তাঁর অপরিসীম। নিজের জন্য কিছুমাত্র সম্বল না রেখে যথাসর্বস্বই তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। বেতন পান বার্ষিক পনেরো হাজার ফ্রাংক মুদ্রা। চৌদ্দ হাজারই বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। অবশিষ্ট হাজার ফ্রাংক দিয়ে তাঁর সারা বৎসরের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হয়।

ব্যয় তাঁর একার নয়, তিনটি প্রাণীর। নিজের, তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী ব্যাপটিস্টিনের এবং তাঁর একমাত্র দাসী মাদাম ম্যাগ-

লোয়ারের। মাদাম ম্যাগলোয়ার দীর্ঘ দিন এই পরিবারে রয়েছে, এবং জীবনের বাকী দিন কয়টাও এই পরিবারেই থাকবে বলে মনস্থ করেছে। বলতে গেলে বিশপ বা তাঁর ভগিনী এই প্রবীণা পরিচারিকাটিকে পরিবারের বাইরের লোক বলে ভাবতেই পারেন না।

তা, যত্র আয় তত্র ব্যয়। হাজার ফ্রাংক দিয়েই দিন গুজরান হয় মহামান্য বিশপের। নিজের গরু আছে। সকালে দোহন করে অর্ধেকটা দুধ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন রোগীদের জন্য। বাকীটুকু থাকে নিজেদের জন্য। সকালে সেই দুধে ভিজিয়ে দুটুকরো রুটি খান বিশপ, তারপর বেরিয়ে পড়েন ভ্রমণে। দুপুরের জলযোগ এবং রাতের ভোজ সবই অতি সাদাসিধে, দীনদরিদ্রের উপযোগী। বাহুল্য আসবে কোথা থেকে? সারা বছরের জন্য বরাদ্দ তো হাজার ফ্রাংক মাত্র!

ডি' শহরের বিশপের জন্য সরকারী প্রাসাদ আছে—বিশাল, জমকালো। মীরিয়েল এসে প্রথমে সেই প্রাসাদেই উঠেছিলেন। পরদিন গেলেন হাসপাতাল পরিদর্শনে। দেখলেন হাসপাতালটি ছোট্ট একটি দোতলা বাড়িতে অবস্থিত। ওপরে নীচে সর্বসাকুল্যে ছয়খানি মাত্র ঘর, তাইতে গাদাগাদি করে রোগীরা থাকে, সেবিকারাও থাকে।

ব্যবস্থাটা বড়ই বিসদৃশ মনে হল বিশপের। দুটি মাত্র বৃদ্ধাকে নিয়ে তাঁর সংসার, সেই সংসারের জন্য অত-বড় বিশাল প্রাসাদ তিনি আটকে রাখবেন, আর বিশ পঁচিশ জন রোগী, তিন চারজন সেবিকা, জনা দুই ভৃত্য—সবাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে মাত্র ছয়খানি ছোট ছোট কামরা—ভগবানের রাজ্যে এমন পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা থাকা অনুচিত বলে তাঁর মনে হল।

সঙ্গে সঙ্গেই এ-ব্যবস্থা পালটে দিলেন বিশপ। হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে এলেন বিশপের প্রাসাদে, এবং নিজে উঠে গেলেন হাসপাতালের ছয়খানা ঘরে। ওপরতলায় ভগিনী থাকেন এবং

মাদাম ম্যাগলোয়ার। নীচে একখানা ঘরে বিশপ শয়ন করেন, আর একখানা ঘরে লাইব্রেরি ও উপাসনা-গৃহ। একেবারে রাস্তার ধারের ঘরখানায় ভোজনকক্ষ। সদর দরজা কখনও বন্ধ হয় না এ-বাড়িতে। যে-কোন লোক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে, এবং ভোজনকালে যদি সে এসে পড়ে, তার জন্যও সঙ্গে সঙ্গেই একখানা থালা সাজিয়ে দেয় ম্যাগলোয়ার।

বিশপের শোবার ঘরের দেয়ালের ভেতর একটা চোরকুঠরি আছে। সেখানে থাকে শুধু একটা বিছানা। অতিথি অভ্যাগত কেউ যদি এখানে রাত্রিবাস করতে চায়, ওই বিছানা দেওয়া হয় তাকেই। বলা বাহুল্য, অতিথি প্রায় দিনই কেউ না কেউ থাকেই। মফস্বল থেকে যাজকেরা আসেন, বিশপের গৃহে ছাড়া তাঁরা আর আতিথ্য গ্রহণ করবেন কোথায় ?

বিশপের জন্য বাড়ির বন্দোবস্ত যেমন করেছেন ধর্মমহামণ্ডল, তেমনি করেছেন গাড়িরও বন্দোবস্ত। গাড়িটাও বাড়ির পথে গেল। বদল হল না, হল বিক্রি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থটা চলে গেল দানে খয়রাতে। ডি'-র বিশপের নিয়ন্ত্রিত এলাকাটি কিন্তু ছোট নয়। বহু বিস্তীর্ণ তো বটেই, পাহাড়ে জঙ্গলে ভরাও বটে। গাড়ি না থাকলে দূরবর্তী অংশগুলিতে যাতায়াত করা কঠিন, বিশেষ করে মীরিয়েলের মত বৃদ্ধের পক্ষে।

সব বিশপই যে নিজের নিজের এলাকার দূরবর্তী বা নিভৃত কোণগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন, তা নয়। এমন অনেক অনেক জায়গা আছে, যেখানে দশ বৎসরেও একবার বিশপের পদধূলি পড়ে না। কিন্তু বিশপ মীরিয়েল অন্য ধাতুর বিশপ। সেজেগুজে সিংহাসনে বসে থাকবার জন্য তিনি যাজকপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন নি। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি খ্রীষ্টানের সঙ্গে তাঁর যেন নাড়ীর যোগ আছে, দেখা সাক্ষাৎ না হলে তারাও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ইনিও মনে করেন কর্তব্যচ্যুতি ঘটল।

কাজেই বিশপকে যেতেই হয়। এমন দিন নেই, যেদিন মীরিয়েল কোন-না-কোন গ্রাম পর্যটনে বেরোন না। কোনদিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোনদিন উপত্যকার গভীরে। কোনদিন বনাঞ্চলের কাঠুরে পল্লীতে, কোনদিন-বা নদীর ধারের ক্ষেতচাষী বা জেলের মহলে। সর্বত্রই লোকে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাদের বিশপকে দেখে, ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে তাঁকে ঘিরে ধরে আর পকেট থেকে লজেঞ্জ বার করে করে তিনি তাদের মাঝে বিতরণ করেন। যেদিন যেখানে বিশপের পদার্পণ হয়, সেদিন সেখানে মহোৎসব।

পায়ে হেঁটেই সাধারণতঃ যান তিনি। যে স্থান বড় বেশী দূরে, বা বড় বেশী দুর্গম, সেখানে বাধ্য হয়েই যানবাহন ভাড়া করতে হয়। যে-কোন সস্তা যান বা বাহন। চাষীর সবজি বইবার এক-ঘোড়ার টাঙ্গাই তাঁর বিশেষ প্রিয়।

তবে এমন জায়গাও আছে, গাড়ি যেখানে চালানো যায় না। সেখানে যান ছেড়ে বাহন। যে-কোন লাঙ্গলটানা হাড়-জিরজিরে ঘোড়া। একবার তো ঘোড়ার অভাবে গাধায় চড়ে এক বর্ধিষ্ণু শহরে গিয়ে উপস্থিত। মেয়র-প্রমুখ মান্যগণ্য লোকেরা বিশপের আগমনের খবর পেয়ে শহরের বাইরেই অপেক্ষা করছেন, তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিশপ এসে নামলেন গাধার পিঠ থেকে।

শহরের লোক অনেকেই হেসে ফেলল।

অন্য লোক হলে অপ্রতিভ হত। কিন্তু বিশপ মীরিয়েল সে-ধাতুর লোক নন। তিনি স্মিতহাস্যে গাধার পিঠ থেকে নেমে যথারীতি দু হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন জনতাকে। তারপর সবাইকে উদ্দেশ করে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বললেন—"ভদ্রমহোদয়েরা! কী দেখে আপনারা কৌতুক অনুভব করছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। এই গাধা, জন্তুটির পিঠে চড়ে একদিন নরত্রাতা যীশু জেরুজালেমের পথ অতিক্রম করেছিলেন। এ-জন্তু পবিত্র। এই পবিত্র প্রাণীর পিঠে আমার মত একটা নগণ্য যাজক কী স্পর্ধায় আরোহণ

করতে গেল, ভেবে আপনাদের তাজ্জব বনে যাওয়ার কথাই বটে। কিন্তু আমার পক্ষের কৈফিয়ত হল এই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমি এতখানি স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছি, পায়ে হেঁটে আসা সম্ভব হল না বলেই। সে-অপরাধ আপনারা নেবেন না জেনেই এ-বৃদ্ধ অতখানি দুঃসাহস করেছে।"

* * *

বিশপের বাড়ির সদর দরজায় তো তালাচাবি নেই-ই, ও-বালাই ওপরে নীচে কোন ঘরেই নেই। দামী জিনিস বলতে বাড়িতে কতকগুলি রুপোর বাসন আছে, আর আছে দুটি ডবল্‌-ঝাড়-ওয়ালা রুপোর মোমদানি। এগুলি বিশপের কোনও এক পিতামহী বা মাতামহীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ব্যাপটিস্টিন সযত্নে রক্ষা করেন এসব। ভগিনীর পক্ষপাতকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই বিশপ এতদিন এদের বেচে দেননি, গরিবদের খয়রাত করবার জন্য।

আছে এগুলি, কিন্তু এদেরও সাবধানে রক্ষার ব্যবস্থা কিছু নেই। বিশপের শোবার ঘরের মাথার দিকে একটা কুলুঙ্গি আছে, তাতেই একটা ঝুড়িতে করে রেখে দেওয়া হয় এসব। যে-কোন রাত্রে রাস্তা থেকে যে-কোন লোক ঘরের ভেতর উঠে আসতে পারে এবং নিঃশব্দে বাসন ও মোমদানি চুরি করে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে খোলা দরজা দিয়ে।

এই তালাচাবির অভাবের কথাটাই সেদিন বিশপের ডিনারের টেবিলে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সন্ধ্যার পর খাওয়ার ঘরে সমবেত হয়েছেন পরিবারের সব কয়টি লোক—বিশপ, তাঁর ভগিনী এবং তাঁর পরিচারিকা। খাদ্য পরিবেশনের সময় এখনও হয়নি, বিশপ কী যেন কী চিন্তায় মগ্ন, অন্য দুজন কথা কইছে নীচু গলায়। কথা নীচু হলে হবে কী, মাদাম ম্যাগলোয়ারের সুরে বেশ একটু উত্তেজনার আভাস পাওয়া

যায়। সে বলছে কী—শহরে একটা ভয়ংকর লোকের আমদানি হয়েছে আজ বিকালবেলা থেকে। তার চেহারা দেখলেই মনে হয় সে খুনে বা ডাকাত। হাতে মস্ত মোটা লোহা-বাঁধানো লাঠি—

কথার শেষে হতাশভাবে সে বলল—"আমাদের আবার কোন দরজায় তালা চাবি নেই।"

শুধু হতাশভাবে নয়, বেশ গলাটা চড়িয়েই সে বলল এই শেষের কথাটি। ফলে বিশপের ধ্যান ভঙ্গ হল, তিনি মুখ তুলে তাকিয়ে স্বাভাবিক হাসিমুখে বললেন—"কী হল মাদাম ?"

অবশেষে কর্তার মনোযোগ আকর্ষণ করা গিয়েছে তাহলে ! এইটিই চাইছিল মাদাম। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে তার বলবার কথাটা আর একবার বলে গেল। উপসংহার করল এই ভাবে—"আমাদের আবার কোন দরজায় তালা নেই। কর্তা যদি বলেন—আমি এক্ষুনি গিয়ে একটা কামার ডেকে নিয়ে আসি। আধ ঘণ্টার ভেতর সে সব কয়টা দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে যেতে পারবে। ইচ্ছে হয় কাল আবার খুলে ফেলুন তালা। আজ রাতটা কিন্তু বড় বিপদের রাত, সাবধান না হয়ে উপায় নেই।"

"ওঃ, একটা কিছু বিপদ হবেই বুঝি আজ রাতে ?"—সকৌতুকে মন্তব্য করলেন বিশপ। সেটা মাদামের কথায় সায় দেওয়া, না মাদামকে প্রশ্ন করা, তা ঠিক বুঝতে না পেরে সে থতমত খেয়ে গেল একটু, উত্তর দিল—"হবে মনে করেই গৃহিণী আর আমি ভাবছিলাম যে—"

গৃহিণী অর্থাৎ বিশপের ভগিনী তাড়াতাড়ি বললেন—"না দাদা, আমি কিছু ভাবিনি।"

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় শব্দ হল একটা, আর সঙ্গে সঙ্গেই বিশপ বলে উঠলেন—"এসো, এসো।"

দরজা ঠেলে ঘরে এসে উঠল এমন একটি মানুষ, যাকে

দেখেই মাদাম ম্যাগলোয়ার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাপটিস্টিনও ভয় পেয়েছিলেন বইকি। কিন্তু ভাইয়ের দিকে তাকিয়েই তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর আকারে-প্রকারে তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না। তেমনি প্রসন্ন ললাট, তেমনি স্মিত হাসি, তেমনি অবিচলিত ভঙ্গী। অমনি ব্যাপটিস্টিনের ভয়-ডর তিরোহিত হল। বিশপ কাছে থাকতে তাঁর বোনের ভয় কী আবার ?

কিন্তু যে লোকটি ঘরে এসে আচমকা উদয় হয়েছে, তাকে দেখে ভয় পাওয়ারই কথা মানুষের। অসম্ভব-রকম পালোয়ানী চেহারা, মানুষের চাইতে দৈত্য বলেই তাকে মনে হয়। মাথায় লম্বা চুলে জটা বেঁধেছে, গোল গোল লাল চোখ ভাঁটার মত ঘুরছে, লোহা-বাঁধানো লাঠির ওপর দু হাতের ভর রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঠিক দোরগোড়াতে, এবং গৃহস্বামীকে কথা কইবার সুযোগ না দিয়েই নিজে ভারী রুক্ষ গলায় বলতে আরম্ভ করল—"কোথাও আশ্রয় মিলল না দেখে গির্জার সামনে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলাম। এক দয়াবতী মহিলা বললেন—'এখানে রাত কাটাতে গেলে তো শীতে জমে মারা পড়বে ! তুমি ওই বাড়িটায় যাও।'—এই বলে এই বাড়িই তিনি দেখিয়ে দিলেন। তা এটা কী ধরণের বাড়ি ? হোটেল তো ? হোটেল না হলে এখানে আমাকে আসতে বলার মানে কী হতে পারে ?"

এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেলেন বিশপ। স্নিগ্ধস্বরে বললেন —"আপনি বসুন। মাদাম, একখানা চেয়ার এঁকে এগিয়ে দাও, আর এঁর সামনে খাবারের থালা দাও।"

মাদাম ম্যাগলোয়ারের কেমন অভ্যাস, আগে-আগে অপছন্দ ব্যাপারে যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক, বিশপের মুখ থেকে আদেশ বেরুলে সে আর দ্বিরুক্তি করতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে তামিল করে।

সুতরাং জাঁ ভ্যালজাঁর জন্য সে চেয়ার এগিয়ে দিল এবং টেবিলে রাখল থালা প্লেট চামচ কাঁটা।

বিশপ লক্ষ্য করে দেখলেন—তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দামী রুপোর বাসনগুলি একখানিও টেবিলে দেয়নি মাদাম। এ-বাড়ির রীতি হল এই যে অতিথি এলেই তার সম্মানের জন্য রুপোর বাসন হাজির করা হবে তার সামনে। তিনি মাদামের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করবার জন্য বললেন—"আজ যেন আমাদের টেবিলের কিছু অঙ্গহানি দেখছি।"

ইঙ্গিত বুঝে বিরস মুখে মাদাম কুলুঙ্গি থেকে রুপোর বাসন এনে টেবিল সাজাল, এবং ডবল-ঝাড়ওয়ালা রুপোর মোমদানিও এনে জ্বেলে দিল জ াঁ ভ্যালজ াঁর সামনে।

সে অভাগা তো হতভম্ব হয়ে বসে আছে সেই থেকে। কেউ তাকে গলাধাক্কা দিতে চাইছে না, কেউ তার ছাড়পত্র দেখতে চাইছে না। বেশ খাতির করে সম্মানের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছে, চেয়ার দিয়েছে বসতে এবং রুপোর বাসনে দিয়েছে খেতে। এ কী রকম কাণ্ড!

কিন্তু এ কখনো সত্য হতে পারে না। একান্তই অবাস্তব কাণ্ড ঘটছে একটা, যার অবসান যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। পরিচয়-পত্রের কথা না উঠে যায় না। উঠলেই তাকে হলদে ছাড়পত্র বার করতে হবে। তারপরই কোথায় থাকবে এই সমাদর! দূর দূর করে তাকে তাড়াবে এরাই, যারা তাকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা কইছে এখন!

তিক্ত অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছে জ াঁর। ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াবার আগেই সে নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত যদি তাকে অনাহারেই বেরিয়ে যেতে হয়, তবে তা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। এই মেকী সমাদর অসহ্য। তার প্রকৃত পরিচয় জেনে তারপর ওরা যা বলবার, তা বলুক! যা করবার, তা করুক!

জ াঁ ভ্যালেজ াঁ যেন হঠাৎই ফেটে পড়ল আগুন-লাগা বারুদের মত। "বলি, এসব ব্যাপার কী? কাকে এত সংবর্ধনা করছেন রুপোর

বাসন আর রুপোর মোমদানি দিয়ে? আমি কোন হোটেলে জায়গা পাইনি কেন, তা জানেন? আমার ছাড়পত্রের রং হল হলদে। আমি উনিশ বছর জেল খেটে পরশু দিন বেরিয়েছি জেল থেকে। নাম আমার জাঁ ভ্যালজাঁ, কিন্তু সরকার আমাকে জানে কয়েদী নং ২৪৬০১ বলে। এ সব জেনেও যদি আপনি আমাকে টেবিলে বসতে দেন, তবে জানব আপনি সাধারণ হোটেলওয়ালাদের মত নন।"

বিশপ স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিলেন—"তুমি উত্তেজিত হয়ো না বন্ধু! এ সব পরিচয় দেবারই কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমাকে দেখামাত্র আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে গেছি। আর সে-পরিচয় তো আমার চিরদিনের জানা! নতুন কিছু নয়!"

"প্রকৃত পরিচয়? চিরদিনের জানা? কী সে পরিচয়?"—কিছু বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে জাঁ।

"সে-পরিচয় এই যে তুমি আমার এক অভাগা ভাই।"

* *

বিশপের শোবার ঘরের সেই চোরকুঠরির বিছানায় ফরসা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে। জাঁ শুয়ে পড়েছে জামাকাপড় না ছেড়েই। তার ঝোলা আর লাঠি রয়েছে পাশেই।

এদিকে একটা পরদা খাটানো। তার আড়ালে বিশপের নিজের শয্যা। আর সেই শয্যার শিয়রেই একটা কুলুঙ্গিতে ঝুড়ি-ভরা রুপোর বাসন ও রুপোর মোমদানিগুলি। জাঁর চোখের সামনেই মাদাম ম্যাগলোয়ার ঝুড়িটি রেখে গেল কুলুঙ্গিতে।

মহিলারা ওপরতলায় চলে গেলেন। বিশপ বাগানে বেরুলেন বেড়াবার জন্যে। রাত দুপুর পর্যন্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে একা একা ঘুরে বেড়ানো তাঁর রোজকার অভ্যাস।

শোওয়ামাত্রই অস্বাভাবিক ক্লান্তিতে অবশ হয়ে পড়ল জাঁ। ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। কখন বিশপ বাগান থেকে উঠে এসে

নতজানু হয়ে ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করেছেন উপাসনা-কক্ষে বসে, কখন তিনি এসে শয্যাগ্রহণ করেছেন তার অতি নিকটেই এ সব কিছুই জানে না জাঁ ভ্যালজাঁ।

হঠাৎ একটা ঘড়ি বেজে উঠল কোথায়, আর সেই শব্দে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল সে। ওই ঘড়ি যেন কিসের সংকেত। ও যেন ডেকে বলছে—"সময় যে গেল! যা করবার, এই বেলা করে ফেল। এ সুযোগ চলে গেলে আর জীবনে আসবে না।"

ধড়মড় করে উঠে বসে জাঁ ভ্যালজাঁ ভাবতে সুরু করল। সুযোগ? হ্যাঁ, সুযোগ বইকি। বাড়িতে ওপরতলায় দুটি বৃদ্ধা। নীচের তলায় একটি বৃদ্ধ। হাতের নাগালেই এক কাঁড়ি রুপোর বাসন। বিক্রি করলে কম করেও কোন্ দুই শো ফ্রাংক না হবে। জেলখানার কর্তারা তার ন্যায্য পাওনা একশো একাত্তর ফ্রাংক থেকে বেশ-খানিকটা ফাঁকি দিয়েছে তাকে। মাত্র একশো নয় ফ্রাংক তার পকেটে। এতে কদিন চলবে তার? ফুরোলেই তো উপোষ। কাজ? কাজ তাকে কেউ দেবে না। জেলকয়েদীকে কাজ দেবার জন্য বয়ে গেছে লোকের।

হাঁ, চুরিই তাকে করতে হবে। তা ছাড়া প্রাণটা বাঁচাবার কোন পথ খোলা নেই তার সামনে।

তা, চুরি যদি করতে হয়, তবে এক্ষুনি শুরু করা যাক না। পুঁজি ফুরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করে লাভ কী হবে?

এই সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছুতে জাঁর সময় লাগল কম নয়। বিশপের—না, বিশপ বলে তাঁকে চিনতে পারে নি জাঁ—অমন গরিব পরিবেশে কোন বিশপ বাস করতে পারে এ তার ধারণাই নেই—কিন্তু এই পাদরীটা লোক ভাল। তার সদাশয় ব্যবহার জাঁর মনে একটা ছাপ রেখে যায়নি, এমন মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু সে ছাপ জলের ছাপ ছাড়া কিছু নয়। দৈন্যের উত্তাপে তা শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্তের বেশী লাগে না। এখন জাঁর মনে হচ্ছে—পাদরীর আদর্শ স্বাভাবিক গেরস্তর জন্য। সে তো স্বাভাবিকও নয়, গেরস্তও নয়। সে একটা

শয়তান, সমাজবহির্ভূত জীব। দেশ, সরকার, সমাজ, সংসার সকলেরই হাত তার বিরুদ্ধে। তারা তাকে একটা রক্তমাংসের মানুষ থেকে নামিয়ে এনেছে যান্ত্রিক ২৪৬০১ নম্বরে। পাদরীর উপদেশ তার কোন কাজে আসবে?

জীবনসন্ধিক্ষণে এমনি সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই হয়। যার ভাগ্য ভাল, তার মনে সুমতিই জয়লাভ করে, যার ভাগ্য মন্দ, সুমতি পরাজয় মানতে বাধ্য হয় তার অন্তরে।

জাঁ ভ্যালজাঁর অন্তরে এই মুহূর্তে কুমতিরই জয় হল।

* * * *

প্রত্যূষে বিশপ বাগানে ভ্রমণ করছেন। একটি কোমল ফুলের চারা কার যেন অসাবধান পায়ের চাপে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তারই ওপর ঝুঁকে পড়ে বিষণ্ণ নয়নে তাকেই নাড়াচাড়া করছেন বিশপ! বাগানের কোণে একটা দোমড়ানো ঝুড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে, সেদিকে একবার তাকিয়ে তার দিক থেকে চোখ তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এমন সময়ে মাদাম ম্যাগলোয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল—"কর্তা! কর্তা! বাসনের ঝুড়িটা কোথায় আপনি জানেন কী?"

"জানি"—বলে কর্তা বাগানের কোণের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

মাদাম ছুটে গিয়ে ভাঙা ঝুড়িটা নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর হতাশ ভাবে বলল, "এ তো শুধু ভাঙা ঝুড়িটা। রুপোর বাসন কোথায়?"

"তা তো জানি না।"—বলে বিশপ আবার কোমর-ভাঙ্গা চারাটার শুশ্রূষায় মন দিলেন। বিড়বিড় করে বললেনও বুঝি—"বাসন নিক, তাতে ক্ষতি নেই। শুধু এই চারাটিকে যদি মেরে না যেত!"

মাদাম ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে—"সেই! সেই দুশমনটা! শহরের লোক তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা তাকে আদর

করে ঘরে ঠাঁই দিলাম। তারই সাজা—এতদিনের যত্নের রুপোর বাসনগুলি গেল।"

বিশপ এবারে মুখ তুললেন। বড় বড় চোখ দুটি মাদামের চোখের ওপর ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে বললেন—"কিন্তু কথাটা হচ্ছে ওই রুপোর বাসনগুলি কি সত্যিই আমাদের ছিল।"

মাদাম ম্যাগলোয়ার একেবারে স্তব্ধ। এ আবার কী সমস্যা? তাদের বাসন তাদেরই ছিল কিনা, এ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে না কি? সে কিছুক্ষণ চুপ করে ঠায় তাকিয়ে রইল মনিবের দিকে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলল—'আমাদের ছিল না?"

"না"—বিশপ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—"কী নির্বোধ আমরা। এতদিন কথাটা মোটেই ভেবে দেখিনি। বাসন আমাদের কী করে হল? সারা পৃথিবীতে এত লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, যেখানে যার ঘরে যেটুকু বাড়তি ঐশ্বর্য আছে, যা ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তাদেরই সম্পত্তি। গরিবের অন্নসংস্থানে না লাগিয়ে আমরা যে রুপোর বাসন ঘরে জমিয়ে রেখেছি—মিথ্যা অভিমানকে তৃপ্ত করবার জন্য, এতে মহাপাপ হয়েছে আমাদের। যে নিয়ে গেছে, সে অভাবগ্রস্ত বলেই নিয়ে গেছে। অভাবগ্রস্ত বলেই সে লোক ওই বাসনের ন্যায্য অধিকারী।"

মাদাম ম্যাগলোয়ার হাঁ করে তাকিয়ে আছে। প্রভুর কথা শুনছে বটে, তার অর্থ বুঝতে পারছে না।

বিশপ নিজের মনেই আবার যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সদর দরজায় শব্দ হল একটা। অভ্যাসমত বিশপ বললেন—"এসো এসো।"

তারপরই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল চারজন পুলিশের লোক, আর তাদের সঙ্গে হাত বাঁধা জাঁ ভ্যালজাঁ।

তিন

সিপাহীদের আগে আগে একজন সার্জেণ্ট, সে এসেই অভিবাদন জানাল—"মহামান্য! এই লোকটাকে আমরা পেলাম শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হল, তাই ধরে ফেললাম অনেক কষ্টে। যা ভেবেছিলাম, তাই! ওর ছাড়পত্রের রং হলদে, এবং ওর ঝোলায় পাওয়া গেল কতকগুলি রুপোর বাসন, যা দেখে আমাদের মনে হল—"

বিশপ ওর কথায় বাধা দিয়েই বলে উঠলেন—"মনে হল যে বাসনগুলি সব আমার? ঠিকই মনে হয়েছে তোমাদের। আমিই বাসনগুলি দিয়েছিলাম লোকটিকে। তা ভাই—"

জঁা ভ্যালেজঁার দিকে তাকিয়ে বিশপ বললেন—"তা ভাই, বাসনের সাথে মোমদানি ছুটিও তো আমি তোমাকে দিয়েছিলাম! ওগুলি তুমি ভুলে ফেলে গিয়েছ বুঝি? এরা তোমাকে ফিরিয়ে এনে কষ্ট দিয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু মোমদানি ছুটি এবারে দিয়ে দিতে পারব বলে খুশীও হচ্ছি। নিয়ে যাও, ওতেও কিছু পয়সা আসবে তোমার।"

হতভম্ব? জঁা ভ্যালজঁার তখন যে-অবস্থা, তাকে হতভম্ব-অবস্থা বললে খুব কম করেই বলা হয়। প্রথমতঃ ওই "মহামান্য" সম্বোধন! গির্জার লোকদের ভেতর 'মহামান্য' সম্বোধন শুধু বিশপদেরই প্রাপ্য! তবে কি ইনি বিশপ! যিনি এই রকম ছয়-কামরার বাড়িতে একান্ত দীনদরিদ্রভাবে একটিমাত্র পরিচারিকা নিয়ে বসবাস করেন? এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

তারপরও আরও গভীরতর আশ্চর্য আছে। পুলিশ তাকে চোর বলে ধরে এনেছে। অথচ বিশপ বলছেন—চুরি সে করেনি, তিনি স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন বাসনগুলি! জঁার চাইতে কে আর

বেশী জানবে এ-ব্যাপারের সত্যমিথ্যা! তা সে তো জানে যে দান সে পায়নি, চুরি করেছিল সে। চুরি! চুরি! ডাহা চুরি!

তবে এ-বিশপ জেনেশুনে মিথ্যা বলেন কেন? তাকে বাঁচাবার জন্যই যে, তাতে তো কোন ভুল নেই! কিন্তু কেন? তিনি কেন অজ্ঞাত অপরিচিত একটা কয়েদীকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলছেন, নিজে ধর্মযাজক হয়েও?

সবই আশ্চর্য! সবই দুর্বোধ্য! জঁা ভ্যালজঁা অভিভূত আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে।

হতভম্ব একা জঁা ভ্যালজঁাই হয়নি! হয়েছে মাদাম ম্যাগলোয়ারও। জঁা ভ্যালজঁাকে ধরে নিয়ে পুলিসেরা যখন এল বামাল সমেত, সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। যাক, এত আদরের, এত গর্বের বাসনগুলি উদ্ধার হল তাহলে। কিন্তু তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল প্রভুর কথাবার্তা শুনে। এ সব কী তিনি বলছেন? তিনি দান করেছেন জিনিসগুলো? ওই দুশমনটাকে? হবেও বা! বিশপের মত আপনভোলা লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। রাত্রির আহারের পর সে তো গৃহিণীর সঙ্গে ওপরে উঠে গিয়েছিল। তখন নিরিবিলিতে নীচে বসে বিশপ যদি দান-খয়রাতে মেতে উঠে থাকেন।

হ্যাঁ, এটা মোটেই অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা। এই সময়ে প্রভু আদেশ করলেন—"মাদাম! বন্ধুটি মোমদানি দুটি ভুলে গিয়েছিলেন, এনে দাও তো!"

প্রভুর আদেশের ওপর দ্বিরুক্তি কখনো করে না মাদাম। সে পায়ে-পায়ে ভেতরে চলে গেল।

হতভম্ব হয়েছে পুলিসের লোকগুলিও। লোকটা যে দাগী চোর, তার প্রমাণ তো ওই হলদে ছাড়পত্র! এই চোরকে মূল্যবান বাসনগুলি দান করবার কী প্রয়োজন হয়েছিল বিশপের, তা তো তারা বুঝতে পারছে না। ইনি বিশপ না হয়ে অন্য কোন লোক হলে তারা তর্ক

করতে পারত, প্রশ্ন করতে পারত। এ ক্ষেত্রে তো কিছুই করবার পথ খোলা নেই!

তবে তারা পুলিস। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হল না তাদের। কাটিয়ে উঠে দ্বিধার সঙ্গে বলল—"তাহলে মহামান্য! এ লোকটাকে ছেড়েই দিই?"

"অবশ্য! তা ছাড়া আর করবার কী আছে? একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, সেটার জন্য আফশোস যতই করি, তোমাদের কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য ধন্যবাদও না দিয়ে পারছি না। তোমরা উচিত কাজই করেছ।"

অভিবাদন করে পুলিসেরা প্রস্থান করল। ততক্ষণে মাদাম ম্যাগলোয়ারও মোমদানি দুটি এনে রেখে গিয়েছে জাঁ ভ্যালজাঁর সামনে। রেখে দিয়ে বুঝি কান্না চাপতে না পেরেই সে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে বিশপের সামনে থেকে। এতদিনকার বাসন আর মোমদানিগুলি সত্যিই গেল তাহলে! আর তারা কোনদিন শোভা পাবে না খাওয়ার টেবিলের ওপরে।

বাগানে এখন বিশপ, আর তাঁর সামনে নতশির জাঁ ভ্যালজাঁ। বিশপ দু পা এগিয়ে এসে হাতখানি রাখলেন জাঁর কাঁধের ওপরে। সে হাতের ভেতর থেকে কি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হল জাঁর দেহে?

না হলে অমন করে কেঁপে উঠল কেন ওই দৈত্যের মত পুরুষটা? চকিতের মত একবার মুখ তুলে বিশপের দিকে এক পলক তাকিয়েই জাঁ তক্ষুনি আবার চোখ নামিয়ে ফেলল। নতমস্তকেই রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল—"এ সবের মানে কী? আপনি এমনটা কেন করলেন!"

"করলাম, যাতে তোমাকে আবার সেই নরকে ফিরে যেতে না হয়, যেখানে মানুষ পরিণত হয় পশুতে। আর কীই বা এমন করেছি আমি? দান? না, আমি যা করেছি, তা মোটেই দান নয়। ও একটা লেন-দেনের ব্যাপার। একটা কেনাবেচা!"

"কেনাবেচা ?" জঁা মুখ তুলে তাকায় আবার। বিশপের কথা সে বুঝতে পারছে না।

"হ্যা, কেনাবেচা !"—সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় কণ্ঠে তাকে বলে যান বিশপ —"বাসন আর মোমদানি আমি তোমাকে দান করিনি। ওইগুলিকে মূল্যস্বরূপ ধরে দিয়ে তোমার কাছ থেকে একটি জিনিস কিনে নিয়েছি আমি।"

"কিনে ? কী ?"—জঁার মুখে কথা ফুটছে না, চোখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নীরব প্রশ্ন।

"আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি তোমার আত্মা। যাকে তুমি শয়তানের সেবায় নিযুক্ত করেছিলে, সেই আত্মাকে কিনে নিয়ে আমি আজ ভগবানের চরণে অর্পণ করলাম। জঁা, অভাগা ভাই আমার, এই কথাটি মনে রেখো প্রতি ক্ষণে, প্রতি পলে অনুপলে। আজ থেকে শয়তানের আর কোন দাবি নেই তোমার ওপর। কায়-মনেপ্রাণে আজ থেকে তুমি ভগবানেরই।"

* * * *

বেলা যখন প্রায় দুপুর, তখন জঁা বসে আছে আরণ্যপ্রদেশে। ডি' থেকে লা-ব্রিয়ে যাবার পথে পড়ে এই জায়গাটা। শহর এখান থেকে নয় দশ মাইলের ভেতরই।

বড় গাছের জঙ্গল এটি নয়। ছোট ছোট ঝোপঝাড় অগুন্তি রয়েছে। তাদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খোলা মাঠের টুকরো।

জঁা বসে আছে একটা ঝোপের আড়ালে, একখানা পাথরের ওপরে। লাঠি আর ঝোলা পাশে পড়ে রয়েছে। সেদিকে দৃক্‌পাতই নেই জঁার। কোন কিছুর ওপরেই দৃষ্টি নেই তার, আকাশ পৃথিবী সবই শূন্য, অর্থহীন তার কাছে। এ কী বিপর্যয় ঘটে গেল তার ওপর দিয়ে ? জেলখানা সে বোঝে, অত্যাচার সে বোঝে, বোঝে না দয়া, মানবতা, আত্মা, ভগবান। অথচ বন্যার প্লাবনের মত অবোধ্য সেই জিনিসগুলিই আচমকা এসে তাকে হাবুডুবু খাইয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত।

নিজেকে নিয়ে সে কী করবে এখন ? ওই বিশপ তার মিত্র না শত্রু ? নতুন পথে তুলে দিয়ে সে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এখন এই অনভ্যস্ত দুর্গম পন্থায় পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে তার হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যায় যে !

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। জাঁ নড়ে না, ওঠে না, মুখ তুলে তাকায় না কোন দিকে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য একেবারে।

শূন্য বনভূমি। এ-পথে লোক-চলাচল বড় বিরল। হঠাৎ কিশোর-কণ্ঠের আনন্দোচ্ছল সংগীত শোনা গেল। জাঁ অবশ্য শুনল না, কোন কিছু শোনবার বা বোঝবার মত অভিনিবেশ তার নেই এই মুহূর্তে।

একটি এগারো-বারো বছরের বালক—গানের ভাষা শুনে মনে হয় সে স্যাভয় প্রদেশের অধিবাসী। এই অঞ্চলের ছেলেরা, শৈশবটা কোনমতে পার করতে পারলেই, বেরিয়ে পড়ে জীবিকার সন্ধানে, নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে নেবার জন্য। এ ছেলেটিও তাই বেরিয়েছে —যাবে ও ডি' শহরে। প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ, যেমনটা হওয়া উচিত এ বয়সে। সংগীতের ঝংকারে পাহাড়ে বনে সেই আনন্দ ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে ছুটে চলছে শহরের দিকে।

শুধু ছুটেই যে যাচ্ছে, তা নয়। খেলতে খেলতে ছুটেছে। পকেটের দুই-সাউ মুদ্রাটা লুফতে লুফতে চলেছে। ছুড়ে দিচ্ছে ওপরে, আবার নিপুণ হাতে ধরে ফেলছে শূন্যে থাকতে থাকতেই।

জাঁ ভ্যালজ্যাঁর গ্রহের ফের আর কি !

ঝোপের আড়ালে বসে আছে জাঁ, ঝোপের ওপাশ দিয়ে ছেলেটা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে। হঠাৎ এইখানে এসেই তার তাল কেটে গেল। যে-মুদ্রাটা এ-যাবৎ একবারও তার হাত থেকে ফসকায়নি, এইবার তা লুফে ধরতে সে পারল না। সাউ মুদ্রাটা মাটিতে পড়েই গড়াতে লাগল, ঝোপের ভেতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ওপিঠে চলে গেল, ঠিক যেখানে পাথরের ওপর পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে জাঁ ভ্যালজাঁ।

সামনে কী একটা উজ্জ্বল বস্তু গড়িয়ে এল দেখে, না ভেবে, না চিন্তা করে একখানি পা তার ওপর তুলে দিল জাঁ।

এদিকে ডবল-সাউটা হাত থেকে ফসকে গড়িয়ে যেতেই ছেলেটা গান থামিয়ে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। ঝোপের ভেতর ঢুকেছে তার মুদ্রাটি, এই পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেছে সে। সুতরাং ঝোপটা তন্ন তন্ন করে সে খুঁজল। তারপর, ঝোপের ভেতর না পেয়ে ঘুরে ঝোপের এপিঠে এল।

ওই যে, ওই লোকটার বুটের তলায় চকচক করছে না তার মুদ্রাটি? হঠাৎ জাঁ ভ্যালজাঁকে এই বিজন প্রদেশে ওভাবে বসে থাকতে দেখেও বালক একটুও ঘাবড়ে গেল না। বরং নির্ভয়ে তার সামনে এসে জোর গলাতেই বলল—"ও মশাই, আমার ডবল-সাউটার ওপরে পা তুলে দিয়েছেন যে বড়? পা তুলুন, আমার মুদ্রা আমি নিই।"

জাঁ ভ্যালজাঁ পূর্ববৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

বালকের ধৈর্যচ্যুতি হল। এখনও ডি' শহর নয় দশ মাইল। রাস্তায় দেরি করলে সন্ধ্যার আগে সে পৌঁছুতে পারবে না। সে দু হাত দিয়ে জাঁর পা ধরে ঝাঁকাতে লাগল। "পা সরান মশাই! পা সরান! কেমন লোক আপনি?"

এতক্ষণে জাঁ ভ্যালজাঁর হুঁশ হল। সে যেন ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে সামনে একরত্তি একটা ছোকরা তার শালের গুঁড়ির মত পা-দুখানা দু হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

সে ধমকে বলে উঠল—"কে তুই?"

বালক বিশেষ গ্রাহ্য করল না সে-ধমক। চটপট জবাব দিল—"আমার নাম জার্ভেই। দেখতে ছোট্টটি বলে সবাই আমায় ক্ষুদে জার্ভেই বলে ডাকে। কিন্তু নাম দিয়ে করবেন কী? পা তুলুন, আমায় অনেক দূর যেতে হবে। আমার ডবল-সাউটা পায়ের তলায় চেপে রেখেছেন কেন?"

আবারও সে জাঁর পা ধরে টানতে লাগল।

জাঁর কণ্ঠ থেকে বেরুলো এক হুংকার—"তুই যাবি কিনা ?"

এবার বালক ভয় পেল। পা ছেড়ে দিয়ে এক লাফে তিন হাত পেছিয়ে এসে সভয়ে তাকাল জাঁর দিকে। এতক্ষণে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হল ছেলেটা। জনমনুষ্য নেই কোন দিকে। একান্ত নিরালা বনভূমি। সামনে এই মানুষটা, যাকে মানুষ বললেও চলে, রাক্ষস বললেও ভুল বলা হয় না। একে সে ঘাটাতে গিয়েছে কোন সাহসে ? এ যদি এক্ষুনি তার গলাটি টিপে ধরে দম বার করে দেয় কাকপক্ষীতেও যে জানতে পারবে না !

সে আর তার ডবল-সাউয়ের মায়া করল না। পেছন ফিরে ডি' শহরের দিকে চোঁচা দৌড় দিল। একবারও আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না তাকিয়ে রাক্ষসটা করছে কী।

রাক্ষস আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছে। ক্ষুদে জার্ভেই-ঘটিত ব্যাপারটুকু তার মনের ভেতর তিলমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। কী করে কাটবে ? সজ্ঞানে তো এ-কাজ করেনি সে। এখনও তার হুঁশ নেই যে তার পায়ের তলায় একটা ডবল-সাউ মুদ্রা পড়ে আছে, পায়ের চাপে ক্রমশঃ বালিতে ঢুকে যাচ্ছে, একটু পরে আর সেটা দেখতেই পাওয়া যাবে না।

কেমন করে এটা সম্ভব হল ? বিশপ না বলেছিলেন যে শয়তানের দাসত্ব থেকে কিনে নিয়ে তিনি জাঁর আত্মাকে ভগবানের চরণে নিবেদন করেছেন ? তবে ? দাসত্বমুক্ত সেই আত্মা কেমন করে আবার শয়তানেরই ঈপ্সিত কার্যটি সমাধা করল, ভগবানের কথা এক বারও চিন্তা না করে ?

এমনটা কখনও কখনও সত্যিই হয়। মন যে-কাজের ওপর বিমুখ, অভ্যাসের বশে দেহ সে-কাজ যেন নিজের অগোচরেই করে যায়। জাঁ যে-কাজ করে বসেছে উনিশ বৎসর নরকবাসের সংস্কারের বশে, সজ্ঞানে সে-কাজ করবার মত মনোবৃত্তি তার আর সত্যিই নেই।

বিশপের হাতের স্পর্শ কাঁধের ওপর এখনও সে অবিরাম অনুভব করছে। সে কি পারে ক্ষুদে জার্ভেই-এর একটা সাউ কেড়ে নিতে ?

সারা দিন ধ্যানস্থ হয়েই কাটল জাঁর। আকাশ যখন অস্তসূর্যের রক্তালোকে রাঙ্গিয়ে উঠছে, তখন হঠাৎ সে উঠে বসল। একটা কী যেন সংকল্প তৈরী হয়ে গিয়েছে তার মনের ভেতর।

কিন্তু উঠে বসতেই পায়ের তলায় কী যেন একটা চকচক করে মুখ ভেংচে উঠল তাকে। তাকে যেন হঠাৎ সাপে কামড়ে দিয়েছে—এইভাবে সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সাউটা বালির ভেতর থেকে তুলে নিয়ে ছু আঙ্গুলের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর—"ক্ষুদে জার্ভেই !" "ক্ষুদে জার্ভেই !" রবে হাহাকার করতে করতে সে তীরবেগে ছুটে চলল ডি' শহরের দিকে।

* * * *

ছোট্ট শহর 'এম'।

লোকসংখ্যা হাজার ছুই মাত্র। অধিকাংশই একটা বিশেষ কুটির-শিল্প অবলম্বন করে দিন গুজরান করে। শিল্পটি আর কিছু নয়—নানা রঙের পুঁতি তৈরি করা। ব্যবসাটি লাভজনক ছিল গোড়ার দিকে।

কিন্তু ছুর্দিন এল। বাজারে হাতে-গড়া পুঁতির প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল—কলের তৈরী পুঁতি। হাতের কারিগরেরা হটতে লাগল সে প্রতিযোগিতায়। এম শহরে মানুষের অন্নের অভাব দেখা দিল।

এই সময়ে ওই শহরে এল সাধারণ একটা খাটিয়ে মানুষ। এক পুঁতির কারখানায় সাধারণ কারিগর হয়েই সে ঢুকল। কারবার তখন মুমূর্ষু। মালিকও মুনাফা পায় না, মজুরেরাও মজুরি পায় না।

এই লোকটার মাথায় কী-এক ফন্দি এল। সে নতুনভাবে পুঁতি তৈরি করতে লাগল। ঢের কম সময়ে অনেক ভাল জিনিস উৎপাদন করে সবাইকে দেখিয়ে দিল সে। তার নতুন পদ্ধতি বড় কারও পছন্দ হল না। তখন সে কিনে নিতে চাইল ছোট কারখানাটি। মালিক তক্ষুনি রাজী।

কী জানি কী সূত্রে কিছু রুপোর বাসন-কোশন ছিল লোকটির। তাই বেচে যা অর্থ পেল, পড়তি-দশার কারবারের দাম দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কারখানার মালিক হয়ে বসবার পরে লোকটির নাম জানল শহরবাসীরা—মসিয়ঁ মাদেলিন।

নতুন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করে মাদেলিন অল্প দিনেই কারবারটির চেহারা ফিরিয়ে ফেললেন। কলের পুঁতির ওপরে টক্কর দিতে লাগল তাঁর হাতের পুঁতি। কারখানা বড় হতে লাগল, নতুন নতুন লোক নিযুক্ত হল। শহরের অন্য কয়েকটা কারখানা এসে, উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল নিজেদের।

এম শহরের আর দৈন্যদশা রইল না। লোকের সাচ্ছল্য ফিরে এল। ফিরে এল মুখের হাসি। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে যে এ শুভ পরিবর্তনের জন্য সবটুকু ধন্যবাদ একটিমাত্র লোকেরই প্রাপ্য। সে লোক ওই মসিয়ঁ মাদেলিন। কৃতজ্ঞ নাগরিকেরা মাদেলিনকে শহরের মেয়র নির্বাচিত করল।

শহরের কয়েক জায়গায় ছড়ানো মাদেলিনের কারখানা। প্রতি জায়গায় আছেন পরিচালক বা পরিচালিকা। মাদেলিনের নির্দেশ-মত কাজ চালিয়ে যান তাঁরা। মাদেলিন এখন সব জায়গায় সমান মনোযোগ দিতে আর পারেন না।

পারেন না, তার কারণ আছে। ব্যবসা ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর আছে। সে-কাজ হল—সারা শহরের যাবতীয় দরিদ্র দুঃস্থ লোকের অভাবপূরণ।

দরিদ্রেরা কেউ নিজে থেকে মেয়রের কাছে এসে দুঃখের কথা জানায়। কেউ নিজে থেকে আসে না। প্রথম শ্রেণীকে নিয়ে কষ্ট পেতে হয় না মাদেলিনের। যাকে যেমন প্রয়োজন অর্থ-সাহায্য দিয়ে দিলেই হল। মুসকিল হয় দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে নিয়ে। এরা সেই জাতীয় লোক—যারা চুপি চুপি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলবে না—"আমায় কিছু দাও।"

এসব লোক কি তা বলে না খেয়ে মরবে ? তা তো হতেই পারে না। তারা যদি সাহায্য নিতে না আসে, সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে তাদের ঘরে। কে কোথায় অভুক্ত অভাবগ্রস্ত আছে, খুঁজে বার করে সাহায্য পৌঁছোতে হবে ঠিক জায়গায়। এই কাজেই মাদেলিনের বেশীর ভাগ সময় যায়।

কারণ, এ-কাজে চর নিয়োগ করা যায় না। চরেরা দরিদ্রের আত্মমর্যাদায় আঘাত না দিয়ে কাজ করতে পারবে না। কাজেই প্রতিটি দুঃস্থের সন্ধান এবং অভাব-মোচন মাদেলিনকে একা করতে হয় নিজের হাতে। অনেক সময়ে দুঃস্থ লোকটি জানতেও পারে না, সাহায্য এল কোথা থেকে—কী সূত্র ধরে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার অনুমান ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছোয়, কারণ দীনদুঃখীর বান্ধব অমন দয়াল মানুষ এম শহরে তো একজনই আছেন।

গোপনে সাহায্য পৌঁছোবার জন্য অনেক সময় মাদেলিনকে দরজা ভেঙে লোকের ঘরে ঢুকতে হয়, তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। সে হয়ত বাড়ি ফিরেই দেখল, তালা ভাঙা। চুরি হয়ে গেছে, অনুমান করে সে হয়ত চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলল। কিন্তু সবাই মিলে ঘরের ভেতর ঢুকল যখন, তখন অবাক হয়ে দেখল যে ঘরের কোন জিনিস তো চুরি যায়নি ; উলটে চোর টেবিলের ওপর রেখে গেছে একটি জ্বলজ্বলে স্বর্ণমুদ্রা।

বিনা বাক্যব্যয়ে সব লোক ঘরে ফিরে যায়, নীরবে একজন লোকের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে।

চার

গ্রামের নাম মণ্টপেলিয়ার।

বড় রাস্তার ওপর একটা ছোট হোটেল।

খরিদ্দারের অভাব হয় না। প্যারি রাজধানী থেকে ডাকগাড়ি

যায় সীমান্তের দিকে, পথে পড়ে অনেকগুলি ছোট-বড় ব্যবসাকেন্দ্র, কারিগর শ্রেণীর লোক সর্বদাই যাতায়াত করে, কিছু কিছু লোক এই হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া করে থাকে বইকি !

সেদিন বিকালবেলা। হোটেলের সাইনবোর্ডটা জ্বলজ্বল করছে লালচে রোদ্দুরে। বোর্ডটা ছোট নয়, থিয়েটারের একখানা 'সিন' বললেই হয়। মাথার ওপর বড় বড় মোটা হরফে লেখা "সার্জেন্ট অব ওয়াটার্লু"। অত বড় লম্বা নাম সচরাচর লোকের মুখ দিয়ে বেরুতে চায় না। প্রায় সবাই হোটেলটাকে সার্জেন্ট হোটেলই বলে।

ছবি একটা আঁকা ছিল এই সাইনবোর্ডের ওপরে। এখন এত ছাপসা হয়ে গিয়েছে যে খুব ঠাউরে না দেখলে কোন অর্থ বার করা যায় না।

কষ্ট করে কেউ ঠাউরে দেখেন যদি, দুটো মানুষের ছবি দেখতে পাবেন। একটার পিঠের ওপর আর একটা। পিঠের লোকটা নিশ্চয়ই আহত, কারণ মোটা রক্তের ধারা তার দেহ থেকে ঝরে পড়ছে। বস্তুতঃ ওই রক্তের দাগগুলোই ছবির ভেতর এখনও খানিকটা স্পষ্ট আছে।

হোটেল মালিক থিনার্ডিয়ার লোকটি হচ্ছে সবজান্তা। হেন কাজ নেই, যাতে সে হাত লাগাতে না পারে। ভালভাবে সমাধা করে তোলবার প্রশ্নই ওঠে না, তবে যা-হোক করে চলনসই কিছু একটা সে খাড়া করবেই। ছবিটাও থিনার্ডিয়ারের নিজের হাতে আঁকা, যা-হোক করে চলনসই একটা জিনিস সে খাড়া করেছে, একটু উদারভাবে বিচার করলে যাকে ছবি নাম দেওয়াও চলে।

মানে কী এ ছবির ? কখনও কখনও খরিদ্দারেরা প্রশ্ন করত বইকি আগে। এখন আর করে না, কারণ ওই ছবিতে আর ছবি নেই। রেখা মিলিয়ে গেছে, রং গুলিয়ে গেছে।

যখন জিজ্ঞাসা করত লোকে, থিনাডিয়ার বুঝিয়ে দিত সাগ্রহে।

এটা ওয়াটালু´র মাঠ, যেখানে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ঁা পরাস্ত হয়েছিলেন ইংরেজ আর প্রাশিয়ানদের হাতে।

ওই যে পিঠের ওপর আহত লোকটি, উনি ব্যারন পণ্টমার্সি, নেপোলিয়ঁার বিশাল বাহিনীর এক বীর কর্নেল। ওয়াটালু´তে তিনি সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন, শবস্তূপের নীচে চাপাই পড়েছিলেন তিনি, সেই অবস্থাতেই নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হতো, কিন্তু বাঁচিয়েছিল এক কর্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক সার্জেণ্ট, নাম তার—হ্যাঁ, নাম তার থিনার্ডিয়ার। এই হোটেলওয়ালা থিনার্ডিয়ারই সেই সার্জেণ্ট।

ভাগ্য বিরূপ। তা নইলে আজ থিনার্ডিয়ারকে এখানে রাস্তার ধারে এই ক্ষুদে হোটেল চালাতে হতো কি? নেপোলিয়ঁা যদি পরাজিত না হতেন, পণ্টমার্সি এতদিনে ফরাসী দেশের কর্তা ব্যক্তিদের ভেতর একজন যে হতে পারতেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর পণ্টমার্সি একটা কর্তাব্যক্তি হলে তাঁর প্রাণদাতা থিনার্ডিয়ারও কি দু-চার লক্ষ ফ্রাংকের মালিক হতো না?

এ-গল্প এবং এ-বক্তৃতা আগে আগে ঘনঘনই করতে হতো থিনার্ডিয়ারকে, আজকাল আর তত করতে হয় না। হয় না যে, তাতে থিনার্ডিয়ার দেশবাসীর নৈতিক অধঃপতনই লক্ষ্য করছে। বীরত্বের সম্মান এদেশে আর নেই। কর্তব্যনিষ্ঠাকে আর কেউ মর্যাদা দিতে চায় না। সে প্রকাশ্যেই টিটকারি দেয় খরিদ্দারদের এ নিয়ে।

কিন্তু ওই যে গল্প—আসলে এটা প্রকৃত ঘটনার সঠিক বিবরণ মোটেই নয়। থিনার্ডিয়ার যে কী চরিত্রের লোক, সেটা বুঝতে হলে সেই আসল বৃত্তান্তটি জানা দরকার।

ওয়াটালু´ যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনটিতে থিনার্ডিয়ার মোটেই ছিল না ওয়াটালু´র মাঠে। সৈনিক সে হয়ত ছিল একদিন। সার্জেণ্ট পদের অধিকারীও হয়ত হয়ে থাকতে পারে কখনও, কিন্তু ওয়াটালু´ যুদ্ধের সমকালে সে সার্জেণ্টও নয়, সৈনিকও নয়।

তবে যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণের অভ্যাসটা তার ছিল।

একশ্রেণীর ঘৃণ্য জীব সব দেশেই সর্বকালে থাকে, তারা যুদ্ধের পর রাত্রির অন্ধকারে চোরা-লণ্ঠনের আলোকে মৃতদেহগুলি হাতড়ে বেড়ায়। অনেক মৃত সৈনিকের পকেটেই অর্থ থাকে, হাতে আংটি, ঘড়ি বা দেহে কোন মূল্যবান অলংকারও থাকা সম্ভব, বাধা দেওয়ার কেউ নেই, এ সুযোগ ওই তস্করেরা ছাড়বে কেন? থিনার্ডিয়ারও ছাড়েনি।

ব্যারন পন্টমার্সি ওয়াটার্লুতে আহত হয়েছিলেন ঠিকই।

রাত্রে থিনার্ডিয়ার এসে মড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে পন্টমার্সির হাতে দেখতে পেল আংটি। সেটা খুলে নিয়ে দেখল খুব দামী হীরের জিনিস। ভাবল—এমন আংটি যার হাতে, তার পকেটে কি কিছু থাকবে না?

সত্যিই মৃতদেহের গাদার নীচে পড়েছিলেন পন্টমার্সি, যদিও তিনি নিজে মরেননি। থিনার্ডিয়ার ওপরের মড়াগুলি সরিয়ে তাঁর পকেট থেকে ঘড়ি এবং টাকার থলি সরিয়ে ফেলল।

এদিকে খোলা হাওয়া পেয়ে পন্টমার্সির জ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণ। থিনার্ডিয়ারকে তাঁর দেহ হাতড়াতে দেখে তিনি ভাবলেন—এই লোকটাই শুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচিয়েছে।

তিনি বললেন—"যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে সম্রাটের কর্নেল ব্যারন পন্টমার্সির সঙ্গে তুমি দেখা করো। তোমার নাম কি?"

"থিনার্ডিয়ার। আমিও সম্রাটের বাহিনীর সার্জেন্ট।"

"থিনার্ডিয়ার, মনে থাকবে। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ। কিন্তু ওই বোধহয় শত্রুসৈন্য আসছে। তুমি পালাও, না হলে বন্দী হবে।"

থিনার্ডিয়ারকে দ্বিতীয় বার বলতে হল না। এর কাছে আর থেকে লাভ কী? বরঞ্চ দূরে কোথাও গিয়ে অন্য মড়াগুলোকে ঘেঁটে দেখলে কিছু মিলতে পারে।

শত্রুসৈন্য সত্যিই এসেছিল, আহত লোকদের তুলে নিয়ে বন্দী করবার জন্য। পন্টমার্সিকে তারা নিয়ে গেল।

থিনার্ডিয়ার এর পর পণ্টমার্সিকে খুঁজেছিল বইকি! কিন্তু তাঁকে আর পায়নি। দীর্ঘদিন বন্দীশালায় থাকবার পর পণ্টমার্সি নতুন রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের কারাগার থেকে বেরুলেন যখন, তখন তাঁর ব্যারন পদবী ওরা কেড়ে নিয়েছে, সৈন্য-বাহিনী থেকে করে দিয়েছে বরখাস্ত, সামান্য ভাতা বরাদ্দ করেছে তাঁর জন্য, যাতে তাঁর দুবেলা উদরান্নের সংস্থানই হওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে অতি দরিদ্র পরিবেশে দিন কাটাতে থাকলেন তিনি।

থিনার্ডিয়ার তাই তাঁকে খুঁজে পেল না।

অবশ্য ভাল করে যে খুঁজবে তাঁকে, সে সময়ই বা কই থিনার্ডিয়ারের? নিজের এবং স্ত্রী-কন্যাদের ভরণ-পোষণ তো করতে হবে। ওয়াটার্লুতে তস্করবৃত্তির সাহায্যে যা উপার্জন করেছিল, তাই দিয়ে খুলল এই হোটেল।

* * *

সেই বিকালবেলা সাইনবোর্ডের ওপর রক্তরশ্মি এসে পড়েছে অপরাহ্ণ সূর্যের।

তারই নীচে দুটি ছোট মেয়ে বসে খেলা করছে—একটির বয়স আড়াই বৎসর, একটির এক। মেয়ে দুটি দেখতে বেশ ভাল, তাদের পরনে কাপড়জামাও বেশ শৌখিন।

মেয়েদের মা হোটেলের দোরগোড়ায় বসে মেয়েদের খেলা দেখছে। এ হল থিনার্ডিয়ারের স্ত্রী।

স্ত্রীটি থিনার্ডিয়ারের মত কুশ্রী তো নয়ই, বরং সেজেগুজে বসলে তাকে ভালই দেখায়। তার ওপরে সে একটু লেখাপড়াও জানে। চারু-কলার চর্চাও করে কিছু কিছু। দেশবিদেশের উপন্যাস তার কোনটাই পড়তে বাকী নেই। তারই ফলে তার বড় মেয়ের নামকরণ হয়েছে ইপোনাইন, ছোট মেয়ের আজেল্‌মা।

একটি ছেলে যদি ওর হয়, তার নাম গ্যাভ্রোব রাখা হবে, এটা সে মনস্থ করেই রেখেছে, কারণ কোন্ এক বিখ্যাত উপন্যাসে সে এক

দেশপ্রেমিক দস্যুর বৃত্তান্ত পড়েছে ইদানীং, তার নাম ছিল গ্যাভ্রোব।

ইপোনাইন আর আজেল্‌মা দোলনায় চেপেছে। একটা পুরানো লোহার গাড়িতে শিকল ঝুলছে একগাছা, সেই শিকলেই ঢুলছে সুন্দর ঢুটি মেয়ে। সূর্য্যাস্তের লালচে আভা এসে রাঙিয়ে দিয়েছে তাদের মুখ বুক সোনালী চুল, একটা দাঁড়িয়ে দেখবার মত দৃশ্যই সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

দাঁড়িয়ে দেখছেও একজন। সে পথচারিণী এক যুবতী। তারও কোলে একটি ঘুমন্ত মেয়ে—বছর তিন তার বয়স। তারও বসন-ভূষণ খুব শৌখিন, দেখতে সে মেয়েটিও সুন্দর।

এই যুবতীর নাম ফাতাঁইন, এম শহরে তার বাড়ি। এতদিন সে প্যারিতে চাকরি করছিল। চাকরিটি আর নেই। কাজেই প্যারিতে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। পিতৃ-পরিত্যক্তা ক্ষুদ্র শিশুকন্যা-টিকে কোলে নিয়ে তাই সে আবার জন্মভূমির দিকে যাত্রা করেছে।

প্যারির গৃহস্থালির সবকিছু বিক্রি করে আশি ফ্রাংক সে সংগ্রহ করে এনেছে, জীবনপথে সেই তার পাথেয়। খানিকটা করে ডাকগাড়িতে উঠছে, খানিকটা করে পায়ে হাঁটছে, যাতে পা খানিকটা বিশ্রাম পায়, আবার পয়সাও বেশী ব্যয় না হয়।

সার্জেন্ট হোটেলের অনতিদূরে সে নেমেছে এসে, ডাকগাড়ি থেকে। যতটা পায়ে হাঁটবে, এবার তারপর কোন হোটেলে রাতটা কাটিয়ে সকালে আবার যতদূর সম্ভব হাঁটবে। এইরকম ভাবেই এম শহরে পৌঁছোবার তার মতলব।

সার্জেন্ট হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল—সন্ধ্যার আগে আরও খানিকটা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত কি না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল শিকলের দোলনায় শিশু ঢুটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর অদূরে উপন্যাসে নিমগ্ন মহিলাটিকেই তাদের মা বলে ধরে নিয়ে তাকেই বলল—"ভদ্রে! অতি সুন্দর ঢুটি সন্তানের মা তো আপনি!"

এমন মা নেই, যে নিজের সন্তানের প্রশংসা শুনলে খুশী না হয়! মাদাম থিনার্ডিয়ারও খুশী হল। খুশীমনে আগন্তুক মেয়েটিকে বলল—"এসো, বসো এখানে। কোথায় যাবে তুমি?"

ফাতাঁইনও ভেবে দেখেছে রাতটা এই হোটেলে কাটানোই শ্রেয়ঃ। এগিয়ে গেলে নিকটে যদি অন্য হোটেল পাওয়া না যায়! সে বসে পড়ল মাদামের কাছে। তার মেয়েটিও জেগে উঠল, এবং নিকটেই সমবয়সী অন্য দুটি শিশু দেখে স্বভাবতঃই তাদের দিকে ছুটল খেলা করবার জন্য।

মাদাম বলল—"তোমার মেয়েটিও সুন্দর। নাম কী ওর?"

"ওর নাম কোজেৎ।"

কোজেৎ ততক্ষণ ইপোনাইন আর আজেল্‌মার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যেন তিনজনে কত যুগের ভাব। তিনটি মাথা একসাথে করে তারা কী যেন খেলায় মগ্ন। মাদাম বলে উঠল—"বাঃ, একেবারে যেন তিনটি বোন।"

ফাতাঁইন এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল বুঝি। সে লুফে নিল মাদামের কথা—"তিনটি বোনের মতই বটে! তা—তিনটি বোনের মতই ওরা তোমার কোলে একসাথে মানুষ হোক না! আমি খরচা দেব ওর। কর না! আমার মেয়েটিকেও তুমি ওদেরই সাথে মানুষ কর না!"

আশ্চর্য প্রস্তাব! দু মিনিটের আলাপে কোন অচেনা মানুষ যে এমন একটা কথা বলে বসতে পারে, তা কে জানত? মাদাম অবাক্ হয়ে ফাতাঁইনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফাতাঁইন তখন নিজের দুঃখের কথাটা বুঝিয়ে বলতে লাগল ওকে। প্যারিতে চাকরি করত। সে চাকরি গেল। অনেক দিন চেষ্টা করল অন্য চাকরি জোটাবার, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে কোলে, তাই দেখে কেউ তাকে চাকরি দিল না। মেয়ের অসুখ করবে, মেয়ে কান্নাকাটি করবে, ফাতাঁইন মেয়ে সামলাবে, না

কাজ করবে ? কোলে শিশু থাকলে কোন মায়ের চাকরি পাওয়া শক্ত হয়।

প্যারিতে হতাশ হয়ে ফাতাঁইন এখন এম শহরে যাচ্ছে। সেখানেও তো এই অসুবিধা ঘটবে ! শিশুর দরুন আপত্তি করবে চাকরি দেনে-ওয়ালারা ! কোজেৎ কোলে আছে বলেই কোজেতের অন্নসংস্থান করা কঠিন হচ্ছে ফাতাঁইনের পক্ষে।

তাই—

মাদাম থিনার্ডিয়ার যদি কোজেৎকে আশ্রয় দেন কিছু দিনের জন্য, ঝাড়া-হাত-পায়ে ফাতাঁইন গিয়ে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে এম শহরে। তারপর, চাকরিতে পাকা হয়ে বসতে পারলে কে আর তাকে হটাবে ? তখন কোজেৎকে সে নিয়ে যাবে নিজের কাছে।

কোজেতের খরচা সে যুগিয়ে যাবে মাসে পাঁচ ফ্রাংক করে।

এই পর্যন্তই বলেছে ফাতাঁইন, হঠাৎ হোটেলের ভেতর থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—"সাত ফ্রাংকের কমে হবে না হে ! মাসে সাত ফ্রাংক।"

মাদাম বুঝিয়ে দিল—কথা কইছে তার স্বামী।

অর্থপিশাচ থিনার্ডিয়ারের সঙ্গে দর-কষাকষি করার সামর্থ্য ফাতাঁইনের কোথায় ? বিশেষ করে, কোজেতের যে একটা আশ্রয় জুটতে যাচ্ছে—সেই আনন্দের আতিশয্যে দরাদরির প্রবৃত্তিই লোপ পেয়েছে তার। সাত ফ্রাংকেই সে রাজী হয়ে গেল। ছয় মাসের অর্থ আগাম দিতে হবে, এবং আপদ-বিপদের জন্য আর দশ ফ্রাংক। আরও সব কী কী বাবদে খুচরা পাঁচ ফ্রাংক আরও।

হিসাব করে সাতান্ন ফ্রাংক জমা দিয়ে দিল ফাতাঁইন। তারপর কোজেতের সব কাপড়জামা। ভাল ভাল পোশাক ছিল ফাতাঁইনের একদিন। কোজেৎ হওয়ার পর সেই সব পোশাক কেটে কেটে মেয়ের শৌখিন পরিচ্ছদ তৈরি করেছে ফাতাঁইন নিজের হাতে। সব জমা হয়ে গেল মাদাম থিনার্ডিয়ারের কাছে।

হিসাবনিকাশ মেটবার পরে কোজেৎকে বুকে চেপে ধরে ফাতাঁইন শুয়ে পড়ল রাতটার মত। আজ শেষ রাত। আর কি কখনও সে কোজেৎকে কোলে নিয়ে শুতে পারবে? আশার চাইতে আশঙ্কা বেশী। পৃথিবী যে বিঘ্নসংকুল! প্রতি পদেই যে গভীর গর্তে পড়ে যাবার আশঙ্কা!

সারা রাত এক পলকের জন্য চোখ বুঝতে পারল না ফাতাঁইন। সারা রাত এক মিনিটের জন্য চোখের জল থামল না তার। তারপর রাত থাকতেই সে উঠে পড়ল, কোজেৎ জেগে ওঠবার আগেই তাকে দূরে দূরান্তরে সরে যেতে হবে।

উষার আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি। সার্জেন্ট হোটেলের অদূরে পুলিস পাহারাওয়ালার চোখে পড়ল—ডাকগাড়ি থামবার নির্দিষ্ট স্থানটিতে দাঁড়িয়ে এক অপরিচিত রমণী কেবলই কাঁদছে, কেবলই কাঁদছে, দু হাতে বুক চেপে ধরে নিঃশব্দে সে শুধু কেঁদেই চলেছে।

তারপর গাড়ি এল কাঁদতে কাঁদতেই ফাতাঁইন গাড়িতে উঠল। গাড়ি গড়গড়িয়ে ছুটল সার্জেন্ট হোটেলের সামনে দিয়ে। সেই শব্দে কোজেৎ হঠাৎ জেগে উঠে পাশ ফিরে শুল, অভ্যাসের বসে মুখ দিয়ে তার একটিবার বেরুলো—"মা।" অভ্যাসেরই বশে দুহাত বাড়িয়ে সে একবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে চাইল। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন বছরের মেয়েটার জীবনে তারপরই নেমে এল বিপর্যয়। ঘুম থেকে উঠে সে দেখল—তার সব ভাল ভাল জামা ইপোনাইন আর আজেল্‌মার গায়ে শোভা পাচ্ছে। তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ওদেরই ছেঁড়া পরিত্যক্ত সব নোংরা জামা। সেই সব পরিয়ে তাকে হোটেলের ঝি-গিরিতে শিক্ষানবীসরূপে বহাল করে নিল মাদাম থিনার্ডিয়ার।

কোজেৎ তিন বছরের শিশু—কিছুতেই বুঝতে পারে না এ-সবের
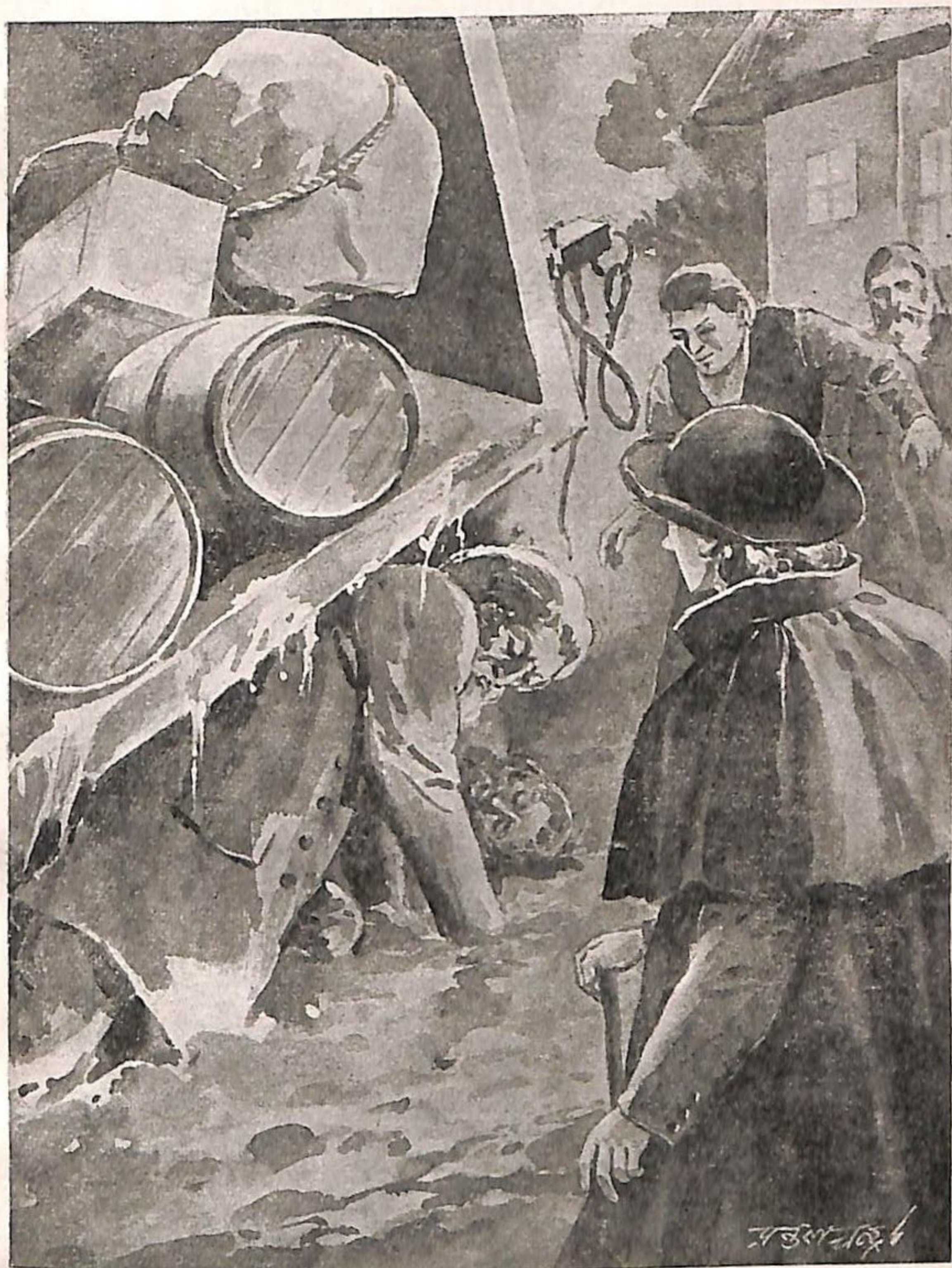
গাড়ি নড়ছে, উঠছে একটু একটু করে।

মানে কী। তারও চেয়ে মর্মান্তিক—সে কোনমতেই ধারণা করতে পারে না যে তার মা আর আসবে না। রাতে সে শুয়েছিল মায়ের কোলে, সকালে উঠে সেই মাকে সে আর দেখতে পায়নি। সে গেল কোথায়? কখন আসবে? কখন? কখন?

* * *

সারা পথ কাঁদতে কাঁদতেই ফাতাঁইন এসে এম শহরে পৌঁছুলো। মেয়র মাদেলিনের পুঁতির কারখানায় শ্রমিক এলেই কাজ পায় সেও পেল অতি অনায়াসেই।

ফাতাঁইন মাসে মাসে সাত ফ্রাংক পাঠায় কোজেতের খরচ। থিনার্ডিয়ারের কাছে চিঠি লিখতে হয়, অর্থ পাঠাতে হয়—এসব সে নিজে করতে পারে না, দরকার হয় অন্যের সাহায্য, কারণ অভাগিনী নিজে যে লেখাপড়া আদৌ জানে না!

কাজেই কারখানায় অচিরেই প্রচার হয়ে গেল যে ফাতাঁইনের একটি মেয়ে আছে—সার্জেন্ট হোটেলের মালিক কে-এক থিনা-ডিয়ারের জিম্মায়। মেয়ে আছে, অথচ সে-মেয়েকে কাছে রাখছে না। উপরন্তু মেয়ের বাবার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে ফাতাঁইন উত্তর দেয় না—এই সবকে ভিত্তি করে একটা কুৎসা রটনা শুরু হয়ে গেল এম শহরে।

ঠিক এই সময়ে থিনার্ডিয়ার তার নখদন্ত জাহির করতে শুরু করল। তার হোটেল মোটেই চলছে না। অথচ ফাতাঁইন যে চাকরি পেয়েছে, তা সে আন্দাজ করেছে। চাকরি না পেলে মাস মাস নিয়মিত অর্থ পাঠাচ্ছে কেমন করে?

চাকরি যখন ফাতাঁইনের হয়েছে, তখন থিনার্ডিয়ার কেন মাত্র সাত ফ্রাংকে সন্তুষ্ট থাকবে? প্রথমে সে লিখল—বারো ফ্রাংকের কমে সে কোজেৎকে রাখতে পারবে না। ফাতাঁইন বারো ফ্রাংকই দিতে স্বীকার করল। তারপরই কিছুদিন চিঠি বন্ধ করে বসে রইল থিনার্ডিয়ার। ফাতাঁইন ভেবে অস্থির মেয়ের জন্য। অবশেষে

সংবাদ এল থিনার্ডিয়ারের কাছ থেকে। আগাগোড়া মিথ্যায় ভরতি এক চিঠি। কোজেতের নাকি খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বহু চিকিৎসার ফলে থিনার্ডিয়ার কোনমতে তার জীবনটি বাঁচিয়েছে, ফাতাঁইন যেন অবিলম্বে চল্লিশ ফ্রাংক পাঠিয়ে দেয়।

নিজের জন্য একটি সাউ সম্বলও না রেখে ফাতাঁইন কোনমতে চল্লিশ ফ্রাংক পাঠিয়ে দিল।

ঠিক তারপরই চাকরিটি গেল ফাতাঁইনের।

সেই যে কুৎসা রটতে শুরু হয়েছিল, তাই দিন দিন বেড়ে গিয়েছে ফাতাঁইনকে কেন্দ্র করে। অবশেষে এমন পর্যায়ে সেটা এসে পৌঁছেছে যে কারখানার তত্ত্বাবধায়িকা তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলেন। তা নইলে কারখানারই সুনাম নষ্ট হয়।

ফাতাঁইনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। এ কী সর্বনাশ হল? কোথায় সে এম শহরে একটা বাসা ঠিক করে মেয়েকে কাছে নিয়ে আসবার স্বপ্ন দেখছে, ঠিক এই সময়ে সব আশাকে আকাশ-কুসুমে পরিণত করে দিয়ে চাকরিটিই তার নষ্ট হয়ে গেল? মেয়রকে সে গলা ছেড়ে অভিসম্পাত করতে শুরু করল। তত্ত্বাবধায়িকা কে? কারবারের মালিক মেয়র মাদেলিন। তার ওপর এই ঘোরতর অবিচারের জন্য সে দায়ী করেছে মাদেলিনকেই।

কে নির্বোধ ফাতাঁইনকে বুঝিয়ে দেবে যে মাদেলিন মালিক হলেও তাঁর কারখানার সাতটা শাখার খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে নিজে তদারক করার সময় তাঁর নেই, বাধ্য হয়েই স্থানীয় পরিচালকের ওপর তাঁকে সব ব্যাপারেই নির্ভর করতে হয়?

ফাতাঁইন পথে পথে ফেরে অন্য চাকরির চেষ্টায়। কিন্তু এম শহরে পুঁতির ব্যবসাই একমাত্র ব্যবসা, এবং সে-ব্যবসার একেশ্বর মালিক ঐ মাদেলিন। তা ছাড়া, ফাতাঁইনের চরিত্র সম্বন্ধে সেই

ভিত্তিহীন রটনাটা কারও কানেই ঢুকতে বাকী নেই। যে দুয়ারে সে যায়, সেই দুয়ারই বন্ধ হয়ে যায় তার মুখের ওপর।

হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস যায়। ফাতাঁইনের দুর্গতি চরমে ওঠে। বাড়ীভাড়া বাকী পড়ে কয়েক হপ্তার, বাড়িওয়ালা তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়। দারুণ শীতে পথে পথে ঘোরে অভাগিনী। খাওয়া কোনদিন জোটে কোনদিন জোটে না।

এই সময় থিনার্ডিয়ারের আর এক চিঠি এল—কোজেতের আবার অসুখ, জীবন সংশয়—পাঠাও ত্রিশ ফ্রাংক, তা নইলে, কোজেৎ যদি মারা যায়, থিনার্ডিয়ার দায়ী হবে না।

ফাতাঁইন এখন কী করে ?

রাস্তায় যেতে যেতে এক দোকানে ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি দেখে—"এখানে মাথার চুল কেনা হয়।"

মাথার চুল ? ফাতাঁইন দারুণ অন্ধকারে আলোক দেখতে পায়। তার মাথার চুল অতি সুন্দর। বেচলে হয় না ? এমন সোনালী, এমন কোঁকড়ানো, এমন ঘনবিন্যস্ত চুল—এর দাম হবে না ত্রিশ ফ্রাংক ?

হ-বে। দোকানদার মনে করল—অমন চুল ত্রিশ ফ্রাংক দামে কিনতে পারলে তারই লাভ। সে ত্রিশ ফ্রাংক গুনে দিয়ে ফাতাঁইনের মাথাটা ন্যাড়া করে তুলে নিল সমস্ত চুলটা।

ন্যাড়া ফাতাঁইন যখন রাস্তায় বেরিয়ে এল, রাস্তার লোক হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। রাস্তার দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল ছুড়তে থাকে। ফাতাঁইনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ত্রিশ ফ্রাংক যোগাড় করেছে। সে তার মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

হায়, কতক্ষণের জন্য ? রাক্ষস থিনার্ডিয়ার রক্তের স্বাদ পেয়েছে। সে দেখছে, চাইলেই অর্থ আসছে। এ-ক্ষেত্রে সে চাইবে না কেন ? মাত্র কয়েক দিন চুপ করে থেকে সে আবার

লিখল—"পাঠাও অর্থ! চল্লিশ ফ্রাংক। মেয়ের অসুখ আরও বাড়তির মুখে!"

এবার? এবার উপায় কী?

হ্যাঁ, এবারও উপায় হল। সেবার গিয়েছিল চুল, এবার গেল দাঁত। দাঁত বড় সুন্দর ছিল ফাতাঁইনের, মুক্তোর মত একেবারে। তার ওপর পাটির সামনের দাঁত দুটি চল্লিশ ফ্রাংক দামেতেই কিনে নিল এক দাঁতের ব্যবসায়ী।

চল্লিশ ফ্রাংক থিনার্ডিয়ারকে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়রকে আর একবার মনে মনে অভিশাপ দিল ফাতাঁইন। সেই মেয়র। যে তার সকল দুর্গতির মূল! বিনা দোষে তার চাকরিটি খেয়ে কোজেৎকে কাছে আনাবারই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে!

এবার এল চরম বিপত্তি!

দাঁত নেই, চুল নেই, ছেঁড়া-কাপড়-পরা ফাতাঁইনকে দেখলে এখন ছেলে বুড়ো সবাই হাসে আর টিটকারি দেয়। শহরের এক নিষ্কর্মা ফাজিল আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। ফাতাঁইনের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে তার ঠিক ঘাড়ের ওপর ঠেসে ধরল এক চাপ বরফ।

রক্ত-জমিয়ে-দেওয়া সেই শীতের দিনে ঘাড়ের ওপর বরফ! শুধু যে গরমেই পোড়ে, তা নয়। শীতেও পোড়ে। ফাতাঁইনের ঘাড়টা জ্বলে উঠল যেন।

জ্বলছিল তার মনটাও। আজই যে, তা নয়। যেদিন চাকরি গিয়েছে, সেদিনই জ্বলতে শুরু হয়েছে। আজ সেই জ্বলুনি—এই ঘাড়ের ওপর বরফের স্পর্শে হঠাৎ যেন দাউদাউ করে শিখা তুলল একেবারে। ফাতাঁইন চোখে রক্ত দেখল যেন, ফিরে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে।

সে-লোকটা এমনটা ভাবতেই পারেনি। তার মত বিলাসী সভ্যভব্য নাগরিকের ওপর যে চড়াও হতে পারে একটা ভিখারিনী মেয়ে, এমন ধারণা তার মাথাতেই আসেনি। সে ধাক্কা সামলাতে

পারল না। পড়ে গেল রাস্তায়। ফাতাঁইনও টাল সামলাতে না পেরে তার ওপরে পড়ল।

দুজনে পথে গড়াগড়ি দিয়ে দিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল, ফাতাঁইনের কাঁধে পড়ল ভারী একখানা শক্ত হাত। ফিরে দাঁড়াতেই সে থরথর করে কেঁপে উঠল।

হাতখানা জ্যাভারের।

পুলিস ইনস্পেক্টর জ্যাভার। যাকে শহরের শিষ্ট দুষ্ট সবাই জানে, সবাই ভয় করে।

জ্যাভার এ-ব্যাপারের গোড়াটা দেখেনি। দেখেনি যে ওই ভদ্রবেশধারী পশু একতাল বরফ চেপে ধরেছিল এই ভিখারিনীর ঘাড়ে। দেখলেও সে এটাকে গুরুতর কোন অপরাধ বলে মনে করত না বোধহয়। কারণ দেশের আইনই তখন এমনি যে গরিবের প্রতি ধনীর কোন জঘন্য আচরণই বিশেষ একটা দণ্ডনীয় ব্যাপার বলে গণ্য হত না।

যাই হোক, বরফ-চাপানো ঘটনাটা জ্যাভারের চোখে পড়েইনি। সে যখন এল, তার চোখে পড়ল এই যে একটা ছিন্নবসনা ভিখারিনী এক অভিজাত ভদ্রলোকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

আইনতঃ এটা গুরু অপরাধ। এবং জ্যাভার হল আইনের একনিষ্ঠ ধারক। সে ফাতাঁইনের হাত ধরে থানার দিকে পা চালাল। যে-সব পথচর আগাগোড়া ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিল, তারাও ফাতাঁইনের স্বপক্ষে কোন কথা বলতে সাহস পেল না, বা বলবার দরকার দেখল না। যেচে কে জ্যাভারের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে বা তার জেরায় পড়তে যাবে? বাবাঃ যে কড়া এবং বদমেজাজী লোক ওই জ্যাভার!

ফাতাঁইন যতই কেঁদে কেঁদে ঘটনাটা বোঝাতে যায়, জ্যাভার কেবলই ধমকে ওঠে। সে নিজের চোখে যতটুকু দেখেছে, তাই কি

যথেষ্ট নয় ? সেটুকুই একে জেলে পাঠাবার পক্ষে প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত।

তখনকার আইন ছিল চমৎকার। এ-সব সামান্য অপরাধে পুলিস কর্মচারীরাই দোষীকে কারাবাসের আজ্ঞা দিতে পারত। জ্যাভার ফাতাঁইনকে নিয়ে থানায় পৌছলো, এবং তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, তার মুখের একটি শব্দেও কর্ণপাত না করে কাগজের ওপর খসখস করে দ্রুত কী সব লিখে ফেলল।

লেখা শেষ করে সে কঠোরস্বরে ফাতাঁইনকে বলল—"সম্ভ্রান্ত এক নাগরিককে অকারণে আক্রমণ করার দরুণ তোমার ছয় হপ্তা জেল দিলাম।"

ফাতাঁইন হাহাকার করে কেঁদে উঠল। যে জিনিসটা সর্বপ্রথম তার মনে উদয় হল—সেটা হল এই যে সে যদি ছয় হপ্তা জেলে থাকে, তাহলে সার্জেন্ট হোটেলে তার রুগ্ণা মেয়ে ততদিন বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। অনবরত টাকা জোগাতে না পারলে তার চিকিৎসা কী করে চলবে ?

কিন্তু জ্যাভার কোন কথা শোনে না। সে ধৈর্য রক্ষা করতেই পারে না। পাপিষ্ঠা দুশ্চরিত্রা নারীরা এমন অস্তিত্বহীন সন্তানের দোহাই দিয়েই থাকে। সে আবার কঠোরস্বরে বলল—"কোনো কথা শুনব না। তোমার ছয় হপ্তা কারাদণ্ড দিলাম।"

আর তারপর শান্ত গভীরকণ্ঠে দরজার ধার থেকে কে যেন আদেশ দিল। হ্যাঁ, জ্যাভারের আদেশের ওপরও আদেশ চালাতে সে ভয় পেল না—"না, এ-দণ্ড দেবার তোমার অধিকার নেই। মামলাটা তুমি যেভাবে সাজিয়েছ, প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তার মিল নেই। এর বিচারের ভার তোমার ওপর দেয়নি আইন, দিয়েছে আমার ওপর। তুমি একে মুক্ত করে দাও।"

ফাতাঁইন এবং জ্যাভার উভয়েই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল—এই

নতুন আদেশ যিনি প্রচার করছেন, তিনি অন্য কেউ নন—মাননীয় মেয়র মাদেলিন।

ফাতাঁইন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। মেয়র? যে-মেয়র তার সকল দুর্গতির মূল, তিনি এসে তাকে আজ মুক্ত করে দিচ্ছেন পুলিসের কবল থেকে? তাকে রক্ষা করতে চাইছেন নির্মম কারাদণ্ড থেকে?

সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

পাঁচ

জ্যাভারের মতই মেয়রও আইন অমান্য করার লোক নন।

জ্যাভার যখন ফাতাঁইনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল, ঠিক তার পরেই মেয়র গিয়ে দৈবাৎ উপস্থিত হলেন সেই রাস্তায়। জনতা তখনও উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে ঘটনাটার। জ্যাভারের সামনে হাজির হয়ে যারা সত্য কথা বলতে সাহস করেনি, তারা মেয়রকে দেখে নির্ভয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এবং স্পষ্টভাবে তাঁকে জানাল যে এ-ব্যাপারে ফাতাঁইনের অপরাধ সামান্যই, ওই পাষণ্ড বড়লোকটা তার ঘাড়ে বরফ চেপে না ধরলে সে এ-কাজ কখনও করত না।

আনুপূর্বিক সব শুনে মেয়র তখনই থানায় গিয়ে দেখা দিলেন, এবং আইনের ধারা উল্লেখ করে জ্যাভারকে বুঝিয়ে দিলেন যে এ মামলার বিচার করবার এক্তিয়ার তার নেই।

জ্যাভার নিরুত্তর। মেয়র ফাতাঁইনকে নিয়ে চলে গেলেন। সব শুনলেন তার ইতিহাস। বিনা দোষে তাঁরই কারখানা থেকে কর্মচ্যুত হয়ে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছে এই অভাগিনী, এ শুনে মেয়রের আর অনুশোচনার অন্ত রইল না।

তিনি তাঁকে তক্ষুনি আবার কাজে নিযুক্ত করে দিতে পারতেন, কিন্তু তার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে খুবই তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হল। তিনি ফাতাঁইনকে নিয়ে গেলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল ফাতাঁইন কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে, খুব সাবধানে না রাখলে যে কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু হতে পারে।

মেয়র ফাতাঁইনকে হাসপাতালেই রেখে দিলেন। সেখানে পরম যত্নে তার চিকিৎসা হতে লাগল।

শুধু শরীরের নয়, তার মনের অসুখের চিকিৎসারও ভার নিলেন মাদেলিন। মেয়ের জন্য তার মনে যে দারুণ অশান্তি, সে-কথা জেনেছেন তিনি, এবং আশ্বাসও দিয়েছেন যে মেয়েকে তিনি ফাতাঁইনের কাছে এনে দেবেন নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে থিনার্ডিয়ার আরও এক দফা অর্থের তাগাদা করেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়র পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই পরিমাণ অর্থ।

ফাতাঁইনের আর অন্য চিন্তা নেই এখন। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, মেয়রের স্নেহের দুর্গে সে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছে। এখন তার একমাত্র ভাবনা—কবে কোজেৎকে আবার সে কোলে পাবে। মেয়র বলেছেন—একটু সময় করতে পারলেই তিনি নিজে গিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে আসবেন।

* * *

ফাতাঁইন ভাল হয়ে উঠতে থাকুক, এই অবসরে একটুখানি পূর্বকথা বলে নেওয়া যাক।

কথাটা জ্যাভারের সম্বন্ধে।

অদ্ভুত ধাতুর লোক এই জ্যাভার। জীবনে একটি জিনিসকে সে শ্রদ্ধা করে, সে-জিনিস হল আইনভঙ্গকারী ব্যক্তির মার্জনা নেই তার কাছে। সে যদি জ্যাভারের পরমাত্মীয়ও হয়, তবুও না।

মেয়র মাদেলিন সর্বজনপূজ্য। কিন্তু একটি লোক তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে, সে ওই জ্যাভার।

সন্দেহ এই কারণে যে মেয়রের পূর্ব ইতিহাস কেউ জানে না। প্রায় আট বৎসর আগে সামান্য কারিগররূপে এই মাদেলিনকে প্রথম দেখা যায় এম শহরে। তার আগে কোথায় ছিলেন মাদেলিন? কি করতেন তিনি?

আট বৎসর। ওই সময়েই একটি জলজ্যান্ত দাগী চোর লোকচক্ষুর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে-চোরের নাম ছিল জাঁ ভ্যালজাঁ। তুলোঁ বন্দরে তার চেহারা একদিন দেখেছিল জ্যাভার, তবে সে বছর পঁচিশ আগে। যে-চেহারা সে দেখেছিল, তা স্পষ্ট মনে আছে জ্যাভারের। মনে আছে, কারণ ভুলবার নয় সে চেহারা। সে যেন এক অসুরের মূর্তি।

সেই চেহারার ভেতর দীর্ঘ পঁচিশ বছরে যে পরিবর্তন আসতে পারে, সেইটা হিসাবের ভেতর আনলে—

হ্যাঁ, সেইটা হিসাবের ভেতর আনলে বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয় না যে সেই জাঁ ভ্যালজাঁই এই মাদেলিন।

কিন্তু তার মনের সন্দেহ তো সে প্রকাশ করতে পারে না মুখে! সন্দেহ তো প্রমাণ নয়। আর প্রমাণ না থাকলে দীনতম লোককেও লাঞ্ছনা করবার অধিকার আইনের নাই। এ তো মহামান্য মেয়রকে নিয়ে কথা!

মনের সন্দেহ মনেই রাখে জ্যাভার, আর সর্বদাই মাদেলিনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। উনিশ বছর যে লোকটা জেল খেটেছে, তার চরিত্র কি একেবারে শুধরে যেতে পারে? জেলখানার গ্লানি নিঃশেষে ধুয়ে মুছে সে কি সত্যি সত্যি দেবদূত বনে যেতে পারে?

আক্রোশ যতই থাক, অন্তরে অন্তরে জ্যাভার স্বীকার না করেই পারে না যে এই মাদেলিনের চরিত্র দেবদূতের মতই নির্মল।

ভান? অভিনয়? অসম্ভব কী? আইনের কবল থেকে

আত্মরক্ষা করবার জন্যই দাগী চোর ভ্যালজাঁ দেবদূতের ভূমিকা অভিনয় করে যাচ্ছে, এ কি একেবারেই হতে পারে না ?

কেন পারবে না ?

জ্যাভার চোখ মেলে থাকে। আশা করে—একদিন না একদিন মাদেলিনের ছদ্মবেশ কোন এক আকস্মিক মুহূর্তে দৈবাৎ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর তার ভেতর থেকে সহসা প্রকট হয়ে পড়বে জাঁ ভ্যালজাঁর স্বরূপ। ধৈর্য ধরে তাই প্রতীক্ষা করে জ্যাভার! আজ কয়েক বৎসর করছে প্রতীক্ষা।

একদিন একটু বুঝি সুযোগও এসেছিল। সে-সুযোগ কিন্তু জ্যাভারের মনের সন্দেহটাকেই আর একটুখানি দৃঢ় করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপকার করতে পারল না জ্যাভারের।

সুযোগটা এসেছিল এই ভাবে।

মাদেলিন যখন নতুন পদ্ধতিতে পুঁতি তৈরি করে পুঁতির কারবারটারই চেহারা পালটে দিলেন, তখন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল এম শহরে। কতক কারবারী ব্যবসা বিক্রি করে দিল মাদেলিনের কাছে, কতক বা ক্ষুদে বখরাদার হয়ে রইল মাদেলিনের কারবারের ভেতরেই।

যারা সব কিছু বেচে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফকলেভেন্ট।

ব্যবসা বেচে নগদ যা-কিছু পেয়েছিল ফকলেভেন্ট, তাই সম্বল করে সে খুলে দিল পরিবহনের ব্যবসা। এ ব্যবসা তার জানা ছিল না, কাজেই ক্রমাগত লোকসান খেতে লাগল।

অবশেষে এমন এক সময় এসে গেল, যখন ফকলেভেন্টের পরিবহন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বলতে রইল একখানি মাত্র মাল-টানা গাড়ি, আর কর্মচারী বলতে রইল ফকলেভেন্টই একা। অর্থাৎ ফকলেভেন্ট নিজেই টেনে নিয়ে বেড়ায় বোঝাই গাড়ি।

একদিন, বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। মেটে রাস্তা খুব

পিচ্ছিল। ভারী গাড়িটা হঠাৎ উলটে গেল সেই রাস্তায়, আর কী-জানি কেমন করে কী হল, ফকলেভেন্ট নিজে চাপা পড়ে গেল সে গাড়ির তলায়।

লোকজন এসে জমতে জমতে গাড়ি নিজের ভারেই কাদার ভেতর অনেকখানি বসে গিয়েছে, ফকলেভেন্ট যেন ইঁদুরের খাঁচায় আটক পড়েছে। বেরুবার কোন পথ কোন দিকে নেই। গাড়িটা নামতে নামতে ক্রমেই তার ওপর চেপে বসছে। আর একটুখানি নামলেই ফকলেভেন্ট পিষে মরে যাবে।

লোক জমেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না, অভাগাকে উদ্ধার করবার জন্য। ওপর থেকে মাল-বোঝাই গাড়ি টেনে তোলা একমাত্র জ্যাকযন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব। তা জ্যাক এখন কোথায়? আর এক উপায় হল নীচে থেকে চাড় দিয়ে গাড়ি উঁচু করে তোলা। যেটুকু ফাঁক আছে গাড়ি আর মাটির ভেতর, তাতে একটিমাত্র লোক কোনমতে সেখানে ঢুকতে পারে। এমন লোক কে আছে, যে নীচে থেকে পিটের চাড় দিয়ে এই বোঝাই গাড়ি তুলতে পারবে, একার শক্তিতে?

সে-চেষ্টা যে করতে যাবে, তারই প্রাণ যাবে, ফকলেভেন্টের সাথে সাথে। গাড়ি অনিবার্যভাবে নামছে। ওর তলায় যে ঢুকবে তাকে আর বেরিয়ে আসতে হবে না। সবাই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হায় হায় করছে।

ইনস্পেক্টর জ্যাভারও দাঁড়িয়ে আছে। সে লোক পাঠিয়েছে জ্যাকযন্ত্র আনবার জন্য। কিন্তু যন্ত্র যে সময় থাকতে এসে পৌঁছবে না, তা বুঝতে কারও বাকী নেই।

এমনি সময়ে সেখানে দেখা দিলেন মেয়র মাদেলিন।

তিনি এসে শিউরে উঠলেন ফকলেভেন্টের সংকট দেখে। এক্ষুনি কিছু করা চাই। জ্যাকযন্ত্রের অপেক্ষায় থাকলে লোকটাকে বাঁচানো যাবে না। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আমি দশ লুই বকশিশ দেব, যদি কেউ ফকলেভেন্টকে বার করে আনতে পারে।"

জনতা নিস্তব্ধ। দশ লুই অনেকটা অর্থ। কিন্তু তার লোভে প্রাণটা কে বিসর্জন দেবে? ও-গাড়ির নীচে ঢোকা মানেই মৃত্যু।

জ্যাভার আস্তে আস্তে কথা বলছে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে। তার সন্দেহ অমূলক কি সমূলক, আজই তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে হয়ত। সে বলছে—"এম শহরে এমন বলবান লোক কেউ আছে বলে তো আমার জানা নেই, যে একার শক্তিতে নীচে থেকে চাড় দিয়ে ওই গাড়ি তুলবে।"

মেয়র শুনলেন তার কথা। একবার মাত্র তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন—"বিশ লুই দেব।"

তবু কেউ অগ্রসর হয় না। গাড়ি আর ফকলেভেণ্টের বুকের মাঝে আর এক ইঞ্চিও তফাত নেই।

জ্যাভার বলছে "না। এম শহরে এমন লোক নেই। অন্য কোন শহরেও নেই। জীবনে একজন মাত্র লোক দেখেছি আমি, যে একাজ করতে পারত। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। পিঠের চাড় দিয়ে বড় বড় গাড়ি উঁচু করত। একটা পাকা দেওয়াল ধ্বসে পড়ছিল একদিন। পিঠ দিয়ে সে ঠেকনো দিয়েছিল সে-দেওয়ালকে। লোকে তাকে নামই দিয়েছিল জ্যাক ভ্যালজঁা।"

মেয়র সব শুনলেন। তারপর বললেন—"পঞ্চাশ লুই দেব, যদি কেউ ফকলেভেণ্টকে বাঁচাতে পারে।"

জ্যাভার কথা কইছে? না, গোখরো সাপ হিসহিস করছে? "ছদ্মবেশে সেই দাগী বদমাইশটা, সেই জঁা ভ্যালজঁা লোকটা এখানে যদি আজ উপস্থিত থাকে, তবেই ফকলেভেণ্টের জীবনরক্ষা হতে পারে, নতুবা নয়। অবশ্য, ভ্যালজঁা থাকলেও—চোর তো! সে কি আর অন্যকে বাঁচাবার জন্য ঝুঁকি নেবে?"

মেয়র ততক্ষণ গায়ের জামা খুলে ফেলেছেন। চারদিক থেকে

বহুলোক চেঁচিয়ে উঠেছে—"মেয়র! মেয়র! করেন কী করেন কী?"

কিন্তু কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না মেয়র! হামা দিয়ে, প্রায় শুয়ে সুকৌশলে সেই গাড়ির নীচে ঢুকে পড়লেন। গাড়ি ফকলেভেন্টের বুকের ওপর চেপে বসছিল, এইবার মাঝ-পথে এই বাধা পেয়ে চেপে বসল তারই ওপরে।

পিঠটা ধনুকের মত কুঁজো হয়ে উঠল মেয়রের। একটা আসুরিক প্রয়াস জগদ্দল বোঝাটাকে ঠেলে উঁচু করবার জন্য! নাঃ, কিছু হল না।

জনতা রুদ্ধনিশ্বাসে তাকিয়ে আছে। যেন তাদেরই বুকের ওপর চেপে বসছে গাড়িটা। জ্যাভারের চোখে মুখে হিংস্র আনন্দ। গাড়ি উঁচু হোক বা না হোক এ-লোক সেই লোক না হয়ে যায় না।

ওদিকে মেয়র দ্বিতীয়বার চাড় দিয়েছেন সেই পাহাড়ের টুকরোর মতন গাড়িখানাকে। মেরুদণ্ড যেন গুঁড়িয়ে যেতে চায়। তবু—ওঠে না, ওঠে না, গাড়ি একচুলও নড়ে না—

"বেরিয়ে আসুন! বেরিয়ে আসুন এখনো!" চিৎকার করে জনতা। কিন্তু হায়, এখন যে আর বেরিয়ে আসার উপায়ও নেই।

জ্যাভার কি ছুটে যাচ্ছে মেয়রকে টেনে বার করবার জন্য? নিশ্চয়ই তাই। দাগী আসামীকে বাঁচাইতে হবে। বাঁচিয়ে আবার তাকে জাহাজের দাঁড়-টানার কাজে লাগাতেই হবে, ক্ষুদে জার্ভেই-এর-ডবল-সাউ কেড়ে নেওয়ার অপরাধের দণ্ড দিতেই হবে।

অবশ্য মোটামুটি বলশালী হলেও গাড়ির তলা থেকে মেয়রকে বার করে আনা তার সাধ্যাতীতই, তবু জনতা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল তার এই প্রয়াস লক্ষ্য করে।

ততক্ষণে মেয়র তৃতীয় বার চাড় দিয়েছেন। এই শেষবার! কারণ তাঁরও দম ফুরিয়েছে। সর্বশক্তি একত্র করে এই শেষবার তিনি

মৃত্যুর পাঞ্জা চেপে ধরেছেন তাঁর নিজের এবং ফকলেভেণ্টের প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

জনতা উল্লাসের উচ্চধ্বনি করে উঠল। গাড়ি নড়ছে, উঠছে একটু একটু করে। জ্যাভার বিজয়ীর হাসি হাসছে এ-লোক সেই জাঁ ভ্যালজাঁ না হয়ে যায় না।

* * *

এরই কিছুদিন পরে ফাতাঁইনের ঘটনা নিয়ে মেয়রে আর জ্যাভারে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে।

আরও কিছুদিন পরে হাসপাতালের ঘরে মাদেলিন এসেছেন ফাতাঁইনকে দেখতে। সেবা-যত্নে আর সুচিকিৎসায় ফাতাঁইন অনেক-টাই সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন সে রোজই আবদার ধরছে কবে মেয়র তার মেয়েকে আনতে যাবেন।

মেয়র নিজে না গেলে যে থিনার্ডিয়ার কোজেৎকে ছাড়বে না, এতে কারোই কোনও সন্দেহ নেই। চিঠি লিখলেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ এসে যাচ্ছে যার দরুন, সেই স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসীকে কেউ হাত-ছাড়া করে না কি?

সম্প্রতি এক চিঠিতে একেবারে পাঁচশো ফ্রাংক দাবি করে পাঠিয়েছে পাপিষ্ঠ। অজুহাত? ওই চিকিৎসা, পরিচ্ছদ, কত কী!

মেয়র ছোট্ট মেয়ের মত ফাতাঁইনের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—"যাব মা, কালই আমি কোজেৎকে নিয়ে আসব গিয়ে। তুমি তো লিখতে জান না, এই কাগজে আমি চিঠি লিখিয়ে এনেছি, তুমি আঙুল দিয়ে টিপসহি দিয়ে দাও। তোমার চিঠি নিশ্চয়ই দেখতে চাইবে ওই লোকটা।"

চিঠিতে টিপসহি নিয়ে মেয়র তখনকার মত বিদায় নিলেন। নিজের অফিসঘরে গিয়ে বসবামাত্র জ্যাভার এসে টুপি খুলে অভিবাদন জানাল। মেয়র তাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী খবর বল, ইনস্পেক্টর?"

আবার অভিবাদন করে জ্যাভার বলল, "খবর খুব গুরুতর। এক অধস্তন কর্মচারী তার ওপরওয়ালার নামে মিথ্যা রিপোর্ট করেছিল। তাকে সাজা দিতে হবে আপনাকেই।"

মেয়র চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এও কি সম্ভব? কে সেই অধস্তন কর্মচারী?"

"সে আমি, মেয়র!"—উত্তর দিল জ্যাভার।

"তুমি? তুমি তার নামে মিথ্যা রিপোর্ট করতে গেলে কেন?"

"আমি আপনার নামেই রিপোর্ট করেছিলাম। মিথ্যা জেনে করিনি! জ্ঞানে বুদ্ধিতে যা অকাট্য সত্য বলে ধারণা হয়েছিল, রিপোর্ট করেছিলাম সেই অনুযায়ী। এখন পুলিশের সদর দপ্তর আমাকে জানাচ্ছেন—আমার ধারণা মিথ্যা। সুতরাং আমি দণ্ডনীয়।"

মেয়রের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মনের কোণে যে একটা আশঙ্কাও উঁকি না দিচ্ছে তা নয়। কিন্তু মনের চিন্তা মুখে প্রকাশ হতে না দিয়ে তিনি শান্তভাবে বললেন—"কী রিপোর্ট করেছিলে আমার নামে, যা পুলিস-দপ্তর মিথ্যা সাব্যস্ত করে উড়িয়ে দিয়েছে?"

"রিপোর্ট এই যে আপনি দাগী চোর, উনিশ বছর কারাবাস করে এসে আবার সঙ্গে সঙ্গেই খুদে-জার্ভেই নামে একটা বালকের ওপর রাহাজানি করে একেবারে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। এই শেষ অপরাধের জন্য সেই থেকে, অর্থাৎ আট বৎসর ধরে ওয়ারেণ্ট ঝুলছে জাঁ ভ্যালজাঁর নামে। সেই ওয়ারেণ্টের বলে আপনাকে গ্রেফতার করবার অনুমতি চেয়েছিলাম আমি!"

জ্যাভার বলে যাচ্ছে, আর মেয়র শুনে যাচ্ছেন। ভাবলেশহীন তাঁর মুখ। খুব নিকটে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেউ সে মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ পেলে অবশ্য বুঝতে পারত যে শুনতে শুনতে মেয়রের মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

পায়ের তলা থেকে পৃথিবী কি সরে যাচ্ছে নাকি? আকাশটা

নিঃশব্দে নেমে এসে তাঁর মাথার ওপর বুকের ওপর চেপে ধরছে নাকি? কেমন যেন একটা কিম্ভুতকিমাকার অনুভূতি ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলতে চায় মেয়রকে।

হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙ্গল। জ্যাভার তার বক্তব্য শেষ করে জানতে চাইছে—'আমার অপরাধের কথা শুনলেন। এখন দণ্ডবিধান করুন।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে তারপর মেয়র বললেন—"তা পুলিস কর্তারা এ-রিপোর্টের উত্তরে কী লিখলেন তোমাকে?"

"লিখলেন যে আমি বেহাদ্দ পাগল হয়ে গেছি!"

"কেন? এ-ধারণা তাঁদের কেন হল? কিসে তাঁরা এমন নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারলেন যে তোমার রিপোর্ট ভুল?"

"বুঝতে পারলেন এই কারণে যে সত্যিকার জাঁ ভ্যালজাঁ আজ কয়েকদিন আগে ধরা পড়েছে অ্যারাস শহরে।"

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল মেয়রের। সত্যিকার জাঁ ভ্যালজাঁ ধরা পড়েছে? কে সে সত্যিকার জাঁ ভ্যালজাঁ?

মুখ দিয়ে তাঁর বেরুলো শুধু একটুখানি কথা—"অ্যারাস শহরে?"

"হ্যাঁ, কালই তার বিচার হবে খুদে জার্ভেই-এর ওপর দস্যুতা করার অপরাধে। এখন আমার দণ্ড কী দেবেন, তাই দয়া করে বলুন। মনে রাখবেন—আমি নিজে কখনও কোন অপরাধীকে দয়া করি না, এবং নিজেও অপরাধ করলে দয়ার প্রত্যাশা করি না। যা আমার যোগ্য দণ্ড, তাই আমাকে দিন আপনি।"

মেয়র শান্তস্বরে বললেন—"আইন দেখে তোমার যোগ্য দণ্ডই দেব। এখন তুমি যাও ইনস্পেক্টর।"

আবার অভিবাদন করে বিদায় নিল জ্যাভার। মেয়র স্থির নিস্পন্দ বসে রইলেন চেয়ারে। কানে শুধু একটি কথা ধ্বনিত হচ্ছে দুন্দুভিনাদের মত—"অ্যারাস! অ্যারাস শহরে! অ্যারাস! অ্যারাস!"

কে এই অভাগা! পুলিস যাকে জাঁ ভ্যালজাঁ বলে গ্রেফতার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে যাচ্ছে! অপরাধ না করেও যে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে অনন্ত নরকে?

এমনি বিচারই করে বটে দেশের আইন। অপরাধী রইল রাজার হালে মেয়রের প্রাসাদে লক্ষ লোকের শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসে দেশব্যাপী স্তুতি কুড়োবার জন্য, আর নিরপরাধ এক দরিদ্র, জীবনে হয়ত কোন অন্যায়ই করেনি বেচারা—তার ওপর নিক্ষিপ্ত হল বিচারের বজ্রদণ্ড—"যাও, জাহাজে বসে দাঁড় টানো গিয়ে সারা জীবন।"

না, না, না, না—

এ হতে পারে না। গুরু মীরিয়েল এ-শিক্ষা দেন নি জাঁ ভ্যালজাঁকে। জাঁ ভ্যালজাঁর পশুহৃদয়কে তিনি শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন, ভগবানের চরণে নিক্ষেপ করবার জন্য। জাঁ ভ্যালজাঁ সেই শ্রীচরণের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়নি এই দীর্ঘ যুগ ধরে। আজই কি সে হারাবে সেই পরম আশ্রয়?

হারাতেই হবে, যদি জেনে শুনে নিজের অপরাধে সে অন্যকে দণ্ডিত হতে দেয়।

মেয়র মাদেলিন পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। শয়নকক্ষে ছুটে গেলেন। সেখানে তাকের ওপর দুটি ডবল-ঝাড়-ওয়ালা রুপোর মোমদানি ঝকঝক করছে জানালা-দিয়ে-গলে-আসা সূর্যালোকে। সেই মোমদানি দুটি মাথায় চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মেয়র—"বল দাও! শক্তি দাও গুরু! ন্যায়পথে দাঁড়াবার সৎ সাহস দাও দীন শিষ্যকে!"

তারপর সারাদিন গেল কর্মব্যস্ততায়। প্রথমেই ছুটলেন ব্যাঙ্কে। এম শহরে আসার পর থেকে অপরিমিত ধনার্জন করেছেন তিনি। তার বৃহৎ অংশই ব্যয় হয়েছে দানে ধ্যানে। তবু এখনও ছয় লক্ষ ফ্রাংক জমা আছে তাঁর নামে। সম্পূর্ণ অর্থ টাই তিনি তুলে নিলেন

ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন প্যারিমুখী রাজপথ বেয়ে। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে হেঁটেও গেলেন বহু দূর। সামনে বিস্তীর্ণ বনভূমি। অরণ্যের নিভৃত এক অংশে বিশেষ একটি স্থানে সেই ছয় লক্ষ ফ্রাংক মাটিতে প্রোথিত করে ফিরে এলেন এম শহরে।

পরদিন—অ্যারাস শহরে।

এক প্রায়-বৃদ্ধ দরিদ্র বন্দীর বিচার হচ্ছে ধর্মাধিকরণে। সে নাকি সেই পলাতক জ্যাঁ ভ্যালজ্যাঁ—এক যুগ ধরে পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে দিয়ে যে পালিয়ে বেড়িয়েছে ক্রমাগত।

সাক্ষীর পর সাক্ষী এসে সনাক্ত করে গেল—এই লোকই জ্যাঁ ভ্যালজ্যাঁ। একে তারা সবাই বিলক্ষণ চেনে। কেউ ছিল লা-ব্রিয়েতে এর প্রতিবেশী, কেউ ছিল ত্যুলোঁতে এর এক-জাহাজের দাঁড়ী, কেউ-বা—

আসামী নিজে শুধু বলে—সে জ্যাঁ ভ্যালজ্যাঁ নয়। নয় যে, সেটা প্রমাণ করবার জন্য একটিও সাক্ষী সে খাড়া করতে পারেনি।

এম শহরের ইনস্পেক্টর জ্যাভারও আছেন সাক্ষীদের ভেতর। তিনি এসে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন—"হ্যাঁ, এই লোকই জ্যাঁ ভ্যালজ্যাঁ বটে। আমি ওকে পঁচিশ বছর আগে ত্যুলোঁতে দেখেছি—একটা দেয়াল ধ্বসে পড়ছিল, এই কয়েদীটা নিজের পিঠের চাড় দিয়ে খাড়া রেখেছিল সেই দেয়াল। একে আমি কখনও ভুলতে পারি ?"

দায়িত্বশীল পুলিস কর্মচারীর এই সাক্ষ্য শুনে বিচারক তক্ষুণি মন স্থির করে ফেললেন। তিনি দণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন—

এমন সময়ে তাঁরই পেছনের বেঞ্চ থেকে একটি লোক উঠে দাঁড়ালেন। সমাগত মাননীয় দর্শকদের বসতে দেওয়া হয় এই বেঞ্চে।

যিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখা গেল, ঘুরে বিচারকের সামনে

এসে দাঁড়াতে। বিচারককে সম্বোধন করে তিনি ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন—"মহামান্য বিচারপতি! এই মামলার সম্বন্ধে আমি অতি প্রয়োজনীয় কিছু জানি। অনুমতি হলে আমি তা বলতে পারি।"

বিচারক চেনেন লোকটিকে, ভদ্রভাবে বললেন,—"মাননীয় মেয়র! প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দেবার জন্য, আদালতের আহ্বান না পেয়েও আপনি যে দূরবর্তী এম শহর থেকে অ্যারাসে এসেছেন, এ আপনার দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক। আপনার যা বলবার আছে, বলতে পারেন।"

মেয়র বললেন—"আমার বলবার কথা হল এই যে—এই আসামী মোটেই জাঁ ভ্যালজাঁ নয়, কাজেই একে মুক্তি দিতে হবে।"

"নয়?" বিচারক বিরক্ত হয়ে উঠলেন—"নয়? এত লোক বলছে—এই লোকই জাঁ ভ্যালজাঁ—"

"তাদের চাইতে আমি অনেক ভালভাবে জানি জাঁ ভ্যালজাঁকে।" একটুখানি থেমে তিনি আবার বললেন—"আমিই জাঁ ভ্যালজাঁ।"

ছয়

ইনস্পেক্টর জ্যাভারের অনেক কাজ, সাক্ষ্য দিয়েই সে এম শহরে রওনা হয়ে পড়েছিল, তা না হলে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা তক্ষুণি সে করে ফেলত।

সে ছিল না, কাজেই প্রকৃত জাঁ ভ্যালজাঁ ওরফে মাদেলিনের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা বেরুতে দেরি হতে লাগল। মেয়র মাদেলিন ততক্ষণে অ্যারাস ত্যাগ করে সরে পড়লেন।

সন্ধ্যা নাগাদ তাঁকে দেখা গেল এম শহরের হাসপাতালে।

অ্যারাস থেকে যদি তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন, কেউ তাঁকে ধরতে পারত না। কিন্তু এম শহরে তাঁর না এসে উপায় নেই। ফাঁতাইন তাঁকে টানছে অদৃশ্য আকর্ষণে। সে অভাগিনীকে তিনি পবিত্র

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তার মেয়েকে তার কোলে তিনি এনে দেবেনই। এখন কোন ব্যবস্থা না করে, কোন কথাই তাকে না বলে তিনি যদি উধাও হয়ে যান—

সে ভাববে কী? সে কি বাঁচবে এই দারুণ আশাভঙ্গের পরেও?

না।

তাই মাদেলিনকে জেনে শুনে বাঘের গুহায় মাথা ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে। বাঘ অর্থাৎ জ্যাভার।

হাসপাতালে যখন মাদেলিন দেখা দিলেন, তখনও অ্যারাসের ঘটনা এম শহরের কেউ জানতে পারেনি। কাজেই স্বাভাবিক সম্ভ্রমের সঙ্গেই সবাই মেয়রকে গ্রহণ করল। মেয়র সোজা উঠে গেলেন ওপরে।

ফাতাঁইনের সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি চিকিৎসক ও সেবিকাদের সঙ্গে কথা কইলেন একটু। তারা একে একে ফাতাঁইনের কক্ষে দেখা দিতে লাগল।

ফাতাঁইনের জীবনের আশঙ্কা এখনও কাটেনি। হৃদ্‌রোগ এখনও প্রবল, আকস্মিক আঘাত বা চমক খেলে হঠাৎই তার মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। তাকে মেয়র কথা দিয়েছিলেন যে আজ কোজেৎকে নে দেবেন তার কাছে। এখন যদি হঠাৎ সে শুনতে পায় যে কোজেৎকে আনা হয়নি, বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

তাই একবার চিকিৎসক, একবার সেবিকা গিয়ে বলতে লাগলেন—"কোজেৎ এসেছে, পাশের ঘরে সে ঘুমিয়ে আছে।"

"তবে? তাকে আমার কাছে আনা হচ্ছে না কেন? সে আমার কোলেই ঘুমুবে এখন।"

"না, তা কি হয়?"—বলে চিকিৎসক আর সেবিকা—"সেটা তোমার এবং তার দুজনের পক্ষেই ক্ষতিকর। তোমরা দু'জনেই গুরুতর পীড়ায় ভুগছ, সেটা ভুলো না। পরস্পরের ছোঁয়াছুঁয়ি না

হওয়াই ভাল আপাততঃ। ও ঘুম থেকে উঠলেই তোমার কাছে নিয়ে আসব।"

বাধ্য হয়েই এ-ব্যবস্থায় সায় দিতে হল ফাতাঁইনকে। মেয়ের পীড়া তার ওপর সংক্রমিত হবে, তাতে সে ভয় পায় না। কিন্তু তার নিজের ব্যাধি এই দারুণ ক্ষয়রোগ, যদি কোজেৎকে ধরে—সর্বনাশ! ভগবান রক্ষা করুন! তার চেয়ে দূর থেকে মেয়েকে দেখেই সে আপাততঃ খুশী থাকবে।

ফাতাঁইনকে এইভাবে যখন তৈরি করা হল, তখন দেখা দিলেন মেয়র। তিনি এসেও সেই কথারই পুনরুক্তি করলেন—যথা কোজেৎ পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে ইত্যাদি—

তিনি হয়ত কাল থেকে আর ফাতাঁইনকে দেখতে আসতে পারবেন না। হঠাৎ তাঁকে দূর দেশে যেতে হচ্ছে। তাতে কোজেতের সঙ্গে ফাতাঁইনের মিলনে কোন বাধা হবে না। তারা মা ও মেয়েতে দীর্ঘদিন এই হাসপাতালেও থাকতে পারবে। তারপরও তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা মেয়রই করবেন দূর দেশ থেকেও—

এই সব কথা মেয়র বলবেন বলে এসেছেন। ঠিক কীভাবে কথাটা শুরু করবেন ভাবছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল—ফাতাঁইনের চোখে মুখে একটা দারুণ বিভীষিকার ছায়া। যেন সে ভূত দেখেছে!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়র পেছন ফিরে দেখলেন—দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যাভার। চোখ তার রক্তবর্ণ, ভাবভঙ্গীর ভেতর দিয়ে একটা চরম হিংস্র নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরুচ্ছে তার।

মেয়রকে তার দিকে ফিরে তাকাতে দেখেই সে বজ্রকঠোরস্বরে হেঁকে উঠল—"চলে আয়। চলে আয়!"

ফাতাঁইনের চোখ ঠিকরে পড়বার মত হল। ভয়ে সে আড়ষ্ট।

এ কথা জ্যাভার কাকে বলছে? নিশ্চয় তাকেই? ঘরে তো সে আর মেয়র ছাড়া আর কেউ নেই!

মেয়রকে সম্বোধন করেই যে জ্যাভার এ কথা বলতে পারে, তা কেমন করে সে জানবে?

ফাতাঁইনের ভয়বিহ্বল অবস্থা দেখে নিজের বিপদের কথাও ভুলে গেলেন মেয়র। জ্যাভারের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি ফাতাঁইনকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—"ভয় নেই মা, তোমার কোন ভয় নাই। তোমার কোন অনিষ্ট ও করবে না।"

জ্যাভারের মনে হল আগাগোড়া এ একটা অতি বিসদৃশ ব্যাপার। পুলিস ইনস্পেক্টরকে সামনে হাজির দেখেও দাগী দস্যু ভ্রূক্ষেপ করবে না? একটা রাস্তার ভিখারিনী রাজরানীর মত খাটে শুয়ে আরাম করবে? সে আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারল না, ধৈর্যের প্রয়োজনও বুঝল না। ছুটে এসে পেছন থেকে একেবারে মেয়রের ঘাড় চেপে ধরল।

ফাতাঁইন আর সহ্য করতে পারল না। জ্যাভার এসে মেয়রের ঘাড় চেপে ধরেছে? দুনিয়া কি ওলটপালট হয়ে গেল না কি? এমন অপ্রত্যাশিত অসম্ভব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখেও তা হজম করে যাবে, এমন অনিন্দ্য স্বাস্থ্য ফাতাঁইনের নয়।

চিকিৎসকদের সতর্কবাণীই খেটে গেল। এ আকস্মিক আঘাত ফাতাঁইন কাটিয়ে উঠতে পারল না। তার চোখটা উলটে গেল, মাথাটা পড়ল কাত হয়ে।

মেয়র ত্রস্ত হয়ে তার বুকে হাত দিয়ে দেখলেন—হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন নেই আর। ফাতাঁইন আর কোজেৎকে দেখতে পেল না।

জ্যাভার তখনও মেয়রের ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে।

এইবার মেয়রও একটা পালটা ঝাঁকানি দিলেন। জ্যাভার ছিটকে গিয়ে পড়ল দোরগোড়াতে। সঙ্গে সে অন্য পুলিস আনেনি, তাড়াতাড়ির

দরুন। তাই নিরুপায় হয়ে শুধু আহত বাঘের মত রক্তচোখে তাকাতে লাগল মেয়রের দিকে।

ঘরের অন্য পাশে একখানা অতিরিক্ত লোহার খাট আছে। মেয়র তারই একটা পায়া ধরে সবলে একটান দিলেন! লোহার খাট থেকে লোহার পায়া মড়মড় শব্দে ভেঙে বেরিয়ে এল। সেই পায়া মাথার ওপর ঘুরিয়ে তিনি কঠোর অথচ অনুচ্চ স্বরে বললেন— "এখন আর পাঁচ মিনিট আমাকে বিরক্ত করো না। করলেই তুমি খুন হবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।"

জ্যাভার নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কেবল তার চোখের অগ্নিদৃষ্টি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চাইছে মেয়রকে।

পায়াটা হাতের কাছেই রেখে মেয়র ফাতাঁইনের মাথাটা বালিশের ওপর সমান করে তুলে দিলেন, তার ওলটানো চক্ষু দুটির পাতা দিলেন বন্ধ করে। তারপর তার গায়ের চাদরে সারা দেহ ভাল করে ঢেকে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে। ভগবানের চরণে ফাতাঁইনের আত্মাকে সমর্পণ করে দিয়ে, তার উদ্দেশে চুপিচুপি বললেন—"মা! আমি আমার কথা রাখব। কোজেৎকে আমি উদ্ধার করে আনবই। তুমি দুঃখ করো না মা!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি জ্যাভারের দিকে ফিরলেন—বললেন —"চল এইবার!"

* * *

সে-রাত্রির মত থানার হাজতেই রাখা হয়েছিল জাঁ ভ্যালজাঁকে, রাত্রেই হাজত ভেঙে সেই পালাল। পালিয়ে গিয়ে উঠল নিজের বাড়িতে, সেখান থেকে বার করে নিল শুধু সেই ডবল-ঝাড়-ওয়ালা রুপোর মোমদানি দুটি।

তারপর সে চলে গেল সেই অরণ্যে, যেখানে লুকানো আছে তার ছয় লক্ষ ফ্রাংক। মোমদানি দুটিও সযত্নে লুকিয়ে রাখল মাটির ভেতর।

কিন্তু পালিয়ে দূরদেশে যাওয়ার উদ্দেশে সে যেমন অরণ্য থেকে বেরিয়েছে, অমনি পুলিস পলটন এসে ঘিরল তাকে। এম থেকে জ্যাভার এসেছে তার অনুসরণ করে করে!

জাঁকে ধরে নিয়েই জ্যাভার ফিরল। অরণ্যে যে জাঁর প্রভূত অর্থ লুক্কায়িত আছে, তা আর সে জানল না।

যথাকালে বিচার হল। খুদে জার্ভেইয়ের একটা ডবল সাউ কেড়ে নেওয়ার অপরাধে জাঁর হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কারণ ইতিপূর্বেই যে উনিশ বছর জেল খেটে এসেছে। জেল থেকে বাইরে এসেই যে আবার তক্ষুণি রাহাজানি করে, তার চরিত্র আর কোনদিনই শোধরাবে এমন আশা বিচারক আর কী করে করতে পারেন?

জাঁ ভ্যালজাঁকে তুলোঁতে নিয়ে জাহাজের ওপর বেঁধে রাখা হল লোহার শিকল দিয়ে। যতদিন বাঁচবে দাঁড় টানবে সে।

পায়ে বেড়ি, হাতে দাঁড়, দিন কাটে জাঁ ভ্যালজাঁর। দিন কাটে যেন স্বপ্নের ঘোরে। মাস যায়, বৎসর যায়—জীবনে পরিবর্তন আসে না কিছু।

তবু জীবনকে সে আঁকড়ে ধরে আছে পরম আগ্রহে। বাঁচতে হবে তাকে, এখনও অনেক কিছু করবার আছে তার। ফাতাঁইনের আত্মার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তার মেয়েকে থিনার্ডিয়ারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এনে সে মানুষ করে তুলবে।

কিন্তু কেমন করে তা হবে? কবে আর হবে? মোটা লোহার বেড়ি দিয়ে সে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁধা। এত মোটা, যে দেহে আসুরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও জাঁ সে বেড়ি ভাঙতে পারে না। তবে কী করে কী হবে? ভগবান কি উপায় করে দেবেন না?

ভগবানই দিলেন উপায় করে।

জাহাজের এক নাবিক একদিন মাস্তুলঘর থেকে টাল খেয়ে পড়ে গেল। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে হাওয়ার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল সে। "গেল, গেল" রব শতকণ্ঠে। জাহাজের

ওপরে পড়লে মাথাটি ছাতু হয়ে যাবে। সমুদ্রে পড়লে অগাধ জলে তলিয়ে যাবে অচেতন দেহ।

কিন্তু চেতনা হারিয়ে ফেলতে ফেলতেও লোকটা আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা করল। মাস্তুল থেকে দড়ির টানা রয়েছে চারপাশে। এক গাছা দড়ি সে ধরে ফেলল হাত বাড়িয়ে। যে-জায়গাটা ধরল—সেটা জাহাজের ডেক থেকে বহু বহু উঁচুতে।

নীচে লোহা দিয়ে মোড়া পাটাতন। হাত ফসকালে সেই পাটাতনে পড়ে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে। আর ফসকাবেও হাত। কতক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবে ওভাবে?

দড়ির গায়ে মই লাগানোও যায় না, আর অত উঁচু মই নেইও জাহাজে। দড়িটা এত ঢালু যে তা বেয়ে নীচে থেকে কারও ওঠা সম্ভব নয়। তবু পোতাধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন—"কেউ যদি ওকে নামিয়ে আনতে পার, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো। সময় নষ্ট করলে ওকে বাঁচানো যাবে না।"

কেউ এগিয়ে এল না। মানুষ পাখি নয় যে উড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরবে।

তখন শিকলে-বাঁধা দাঁড়ীদের ভেতর থেকে একজন বলল "বেড়ি খুলে দিলে আমি পারি ওকে নামিয়ে আনতে।" সে জাঁ ভ্যালজাঁ।

অধ্যক্ষ হাতে স্বর্গ পেলেন যেন। তক্ষুনি ওর বেড়ি খুলিয়ে দিলেন।

ঢালু দড়ি দুই হাতে ধরে ঝুলছে জাঁ। সেই অবস্থায় সে একটু একটু করে ওপরে উঠছে, দুখানা হাতের ওপর দেহের ভার রেখে, এবং সেই হাত দুখানার সাহায্যেই অত-বড় দেহটাকে টেনে তুলে তুলে। বাহুর পেশীগুলো ফুলে উঠেছে অজগর সাপের মত, নীচে থেকে শত চক্ষু সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সেই পেশীর দিকে।

জাঁ গিয়ে ক্রমশঃ পৌঁছোলো ঝুলন্ত নাবিকের কাছে। "আমার পিঠের দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধর"—বলল তাকে।

তারপর সেই দড়ি বেয়েই সে ধীরে ধীরে নামল নাবিককে পিঠে নিয়ে। পাটাতনে পা দিতেই সব নাবিকেরা ভিড় করে ঘিরে ধরল তাদের যমের মুখ থেকে ফিরে পাওয়া সাথীকে। জঁার দিকে তখন আর দৃষ্টি নেই কারও।

সেই সুযোগে জঁা ভ্যালজঁা লাফ দিল সমুদ্রে। "ধর, ধর" চিৎকার উঠল শতকণ্ঠ থেকে। দু চারজন লাফও দিল, জল থেকে জাঁকে ধ'রে আনবার জন্য। কিন্তু সে কি আর সম্ভব? সমুদ্রে পড়েই জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে জঁা। ডুব সাঁতার দিয়ে বহু দূরে গিয়ে তুলেছে মাথা। দু চারবার লম্বা নিশ্বাসে খানিকটা টাটকা হাওয়া টেনে নিয়ে আবার সে দিয়েছে ডুব।

জঁা ভ্যালজঁা পালাল আবার।

*　　　*　　　*

পাহাড়ের অধিত্যকায় মণ্টপেলিয়ার শহর। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এক ছোট্ট নদী। এই নদীর জলই মণ্টপেলিয়ারবাসীদের সব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সারা দিন কলসী বালতি কাঁধে কাঁখে মাথায় নিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে শহরের লোক অবিরত শহর থেকে নদীতে যাচ্ছে এবং নদী থেকে বাড়ি ফিরছে। রাত্রে কেউ নদীর দিকে যায় না, কারণ পথটা ঘন বনে সমাচ্ছন্ন। সে-বনে হিংস্র পশু আছে, ভূতও আছে বলে লোকের বিশ্বাস।

এই মণ্টপেলিয়ারেরই রাজপথে সেই ছোট্ট হোটেলটি—নাম যার 'সার্জেন্ট অব ওয়াটার্লু', মালিক যার ভূতপূর্ব সার্জেন্ট থিনার্ডিয়ার। এ হোটেলের সব জলও ওই বনান্তরালের নদী থেকে আনা হয়।

গৃহস্থ বাড়ির জলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। সেইটুকু জল দিনের বেলায় এনে রাখলে রাতটার জন্য আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু হোটেলের বেলায় তো আর সেকথা খাটে না। হঠাৎ রাত্রি-বেলায় যদি অপ্রত্যাশিত পথিক কয়েকজন এসে পড়ে, তাহলেই মুশকিল। তাদের নিজেদের জন্য জল চাই, তাদের ঘোড়াগুলিরও

জল চাই। এত জল তো আগে থাকতে সংগ্রহ করে রাখা যায় না সব দিন!

সেদিন রাতটা খুবই অন্ধকার। চাঁদ তো আকাশে নেই-ই, নক্ষত্র গুলোও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে হাড়ের ভেতরে, থিনার্ডিয়ারেরা হোটেল-ঘরে আগুন জ্বেলে একটুখানি গরম হওয়ার চেষ্টা করছে।

এমনি সময় এল কয়েকজন অতিথি। শোরগোল পড়ে গেল। স্বাগত সম্ভাষণ, দর কষাকষি ইত্যাদি যথাযথ চলছে ওদিকে, এদিকে মাদাম থিনার্ডিয়ার স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে হুকুম করলেন—"চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে কোজেৎ? এতগুলো লোক এল, ঘোড়া এল চার চারটে—জল নিয়ে আয় শীগগির।"

ঠিক এই ভয়টাই করছিল দুঃখিনী কোজেৎ। অসময়ের অতিথি মানেই কোজেতের দুর্ভোগ। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে কোজেৎ এই হোটেলের বিনা-বেতনের দাসীর পদে বহাল হয়েছে, এখন তার বয়স আট। সে বাসন মাজে, কয়লা বাছে, জল আনে, খাবার পরিবেশন করে। বিনিময়ে টেবিলের পরিত্যক্ত গুঁড়ো-গাড়া খাবার খায় আর ইপোনাইন, আজেলমার ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরে। শোয়া? কয়লার ঘরেরই এক কোণে একটা ভাঙা বেঞ্চিতে সে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয় রাত্রিবেলা।

আজ এই কনকনে ঠাণ্ডা আঁধার রাতে এক মাইল দূরের নদীতে জল আনতে যেতে হবে, বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে, এই কল্পনাতেও বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ছোট আট বছরের মেয়েটার। সে কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলল—'মাদাম! বড় যে অন্ধকার!"

"অন্ধকার বলে কি খদ্দের জল না হলে শুনবে?" হিংস্র জবাব এল মাদামের তরফ থেকে। আর কথা বাড়ালে লাভ নেই, মাঝখান থেকে হয়ত চ্যালা-কাঠের দু এক ঘা খেতে হবে, চোখের জল মুছে বড় একটা বালতি হাতে নিয়ে কোজেৎ বাড়ি থেকে বেরুলো!

আধ মাইল-টাক রাস্তার দু পাশে বাড়িঘর আছে মানুষের। বন্ধ বাতায়নের ওধারে কথাবার্তা শোনা যায়। আলোরও আভাস পাওয়া যায় বুঝি। এ-পর্যন্ত ভয়-ভীতির কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপর—

তারপর থেকেই বিপদ। লোকালয় পার হয়ে মাঠের ভেতর পড়েছে কোজেৎ, মাঠে কী ঠাণ্ডা! হোটেলের ভেতর যাকে ঠাণ্ডা হাওয়া মনে হচ্ছিল, এখন তা জানান দিচ্ছে তুষার-ঝড়ের আকারে। গায়ে তো গরম কাপড় নেই বললেই হয় কোজেতের! ভূত এবং ভালুকের ভয় সত্ত্বেও কোজেৎ বনের আশ্রয়ের দিকে দ্রুত ছুটে চলল। এত বেশী ঠাণ্ডা নয় বনের ভেতরে।

বনের ভেতর ঢুকেও আরও প্রায় সিকি মাইল। চেনা পথ, তা নইলে ঘুরঘুটি অন্ধকারে পদে পদে সে আছাড় খেয়ে পড়ত। এখন ভয় শুধু ওই ভূত আর ভালুকের। গ্রাম্য কুসংস্কারে ভরপুর মেয়েটার কুশিক্ষিত মন এবং মগজ; গাছে গাছে সে ভূত দেখে। চলতে চলতে প্রাণান্তেও পেছন ফিরে তাকায় না, পাছে হঠাৎ মুখোমুখি দেখতে পায় সদ্য কবর-থেকে উঠে আসা কোন হাড্ডিসার প্রেতাত্মাকে। বনের ভেতর দিয়ে শুঁড়িপথ বেয়ে বেয়ে অবশেষে নদীতে এসে পৌঁছোলো কোজেৎ। চোখে কিছুই ঠাহর হয় না। কুলুকুলু ধ্বনি শুনেই অনুমান করে নিতে হল যে সামনেই জল।

বাঁধানো ঘাট নয়, কাঠকুটো দিয়ে একটা নামবার জায়গা তৈরি করেছে গ্রামের লোক। উঁচুনীচুও বটে, পেছলও বটে। পড়লেই হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা।

ঘাটের প্রতি ইঞ্চি জায়গা কোজেতের মুখস্থ, কাজেই সে আছাড় খেলো না। বালতিটা ভরল এবং কষ্টেসৃষ্টে টেনেও তুলল জল থেকে। তারপরই শুরু হল প্রাণান্ত কষ্ট। দিনের বেলায় এই বড় বালতিটা সে প্রায়ই আনে না, কারণ এটাতে জল ভরলে বয়ে নিয়ে

যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়েই দাঁড়ায়। ছোট বালতি আনে, এক-বারের জায়গায় দুবার আসতে হয় যদি, সেও ভাল।

আজ রাত্রে কিন্তু সে একটাই নিয়ে এসেছে। দুবার যাতে না আসতে হয়, সেই জন্যই।—এই রাত্রে একবার আসাই যম-যাতনা, দুবার আসার কল্পনাই তো করা যায় না !

তা ঠিকই করেছে কোজেৎ। কিন্তু ভরা বালতিটা নিয়ে যাওয়াও তো অসম্ভব ! দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কোনমতে নদীর পাড়ে সে ওটাকে তুলল বটে, কিন্তু আর তো এগুতে পারে না। প্রাণপণ করে দু পা যদি এগোয়, তারপরই বালতি মাটিতে নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কালঘাম ছোটে এই দারুণ শীতের রাতেও, বুকের ভেতর ধড়াসধড়াস শব্দ হয়, হাপরের শব্দের মত।

তবু সে হাঁটে, তবু জলের বালতি নিয়ে পায়ে পায়ে এগোবার চেষ্টা করে। হাত দুখানা ছিঁড়ে যেতে চায় কাঁধের নীচে থেকে, কান্না আর চাপতে পারে না কোনমতে। মা-কে সে জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে নি, আজ এই নিদারুণ কষ্টের মুহূর্তে সেই অদেখা মা-কে উদ্দেশ করেই সে হাপুসনয়নে কেঁদে উঠল—"মা। মাগো !"

ঠিক সেই সময় একখানি হাত এগিয়ে এসে তার হাত থেকে জল-ভরা বড় বালতিটা তুলে নিল। মোটা, শক্ত, লোমশ একখানা হাত। অন্য সময় হলে ভূত মনে করে মূর্ছা যেত কোজেৎ, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল—এ যদি ভূত হয়, তাহলে বলতে হবে মানুষের চেয়ে ভূত ভাল, ভূতের দয়া ধর্ম আছে।

একখানা মোটা হাত বালতি তুলে নিয়েছিল কোজেতের হাত থেকে। আর একখানা মোটা হাত কোজেতেরই সেই হাতখানা ধরল পরম স্নেহে। কোজেৎকে নিয়ে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কথা কইল বেশ কিছুক্ষণ পরে—

"এত রাতে জল নিতে এসেছ যে ?

কোজেৎ কাঁদো কাঁদো সুরে বলল—"আসতে তো হয়ই !"

"হয়ই ? রোজ ? সে কি ? তোমার মা নেই বুঝি ?"—প্রশ্নগুলো কে যেন একের পর এক ঠেলে বার করে দেয় আগন্তুকের মুখ থেকে।

"না, মা নেই। থাকলেও আমি তাকে কখনও দেখি নি। শুনেছি মা এম শহরে থাকত। অনেক—অনেক দিন খবর আসে নি। বোধ হয় সে আর নেই।"

আগন্তুকের যে-হাত কোজেতের হাতখানি ধরে ছিল, তার মুঠি যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। আগন্তুক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চুপি চুপি যেন ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার নাম কী ?"

"নাম আমার কোজেৎ"—

* * * *

সে রাত থিনার্ডিয়ারের হোটেলেই কাটাল জাঁ ভ্যালজাঁ। পরদিন প্রস্তাব করল—থিনার্ডিয়ার কোজেৎকে দিয়ে দিক তার হাতে! থিনার্ডিয়ার তো অবাক্। কিন্তু দাঁও পেলে তা ছাড়বার পাত্র সে নয়। "দিয়ে দেব ? বেশ, পনেরোশো ফ্রাংক যদি দিতে পার, নিয়ে যাও।"

তক্ষুনি পনেরোশো ফ্রাংক গুনে দিয়ে জাঁ কোজেৎকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। কোজেতের আনন্দ দেখে কে! একটা বড় পুতুল জাঁ তাকে কিনে দিয়েছে, সেইটি কোলে নিয়ে নাচতে নাচতে সে তার নতুন পাওয়া বন্ধুর হাত ধরে পথ চলতে লাগল। জাঁ তাকে নিয়ে মন্টেপলিয়ারের অরণ্যেই এসে পড়ল। দিনের বেলায় অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোই তার মতলব, পথ চলবে রাত্রে। জ্যাভার তার পিছু ছাড়ে নি।

থিনার্ডিয়ারের কিন্তু খুন চেপেছে মাথায়। মাদাম বলছে—"তুমি গাধা। ওর এত টাকা যখন, আর কোজেতের ওপর ওর মন পড়েছে যখন, তখন পনরো হাজার চাইলেও দিত! তুমি পনেরোশো মাত্র চাইলে ?"

থিনার্ডিয়ার ছুটতে ছুটতে বনে গিয়ে জাঁকে ধরল—"ওহে! ওর মায়ের চিঠি না পেলে আমি ওকে ছাড়তে পারি না। তুমি টাকা ফিরিয়ে নাও—মেয়ে আমায় ফিরিয়ে দাও।"

জাঁ পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে দিল—ফাঁতাইনের টিপসই দেওয়া সেই চিঠি, যাতে সে কোজেৎকে দিয়ে দেবার কথা লিখেছিল থিনার্ডিয়ারকে।

সাত

সেই ব্যারন পন্টমার্সি।

সম্রাট্ নেপোলিয়ঁার পরাজয়ের পর ধাপে ধাপে নেমে যেতে লাগলেন ভদ্রলোক। সৈন্যবাহিনী থেকে চাকরি গেল, নতুন বোর্বো রাজবংশ তাঁর ব্যারন উপাধিও স্বীকার করল না। কর্নেল পন্টমার্সি নামে সামান্য কিছু ভাতার অধিকারী হয়ে তিনি প্যারী শহরের এক দরিদ্র পল্লীতে বসবাস করতে লাগলেন!

তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়েছিল অনেক আগেই! সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন—পুত্র মেরায়াস। তাকে এখন প্রতিপালন করে কে?

মাতামহ গিলেনরম্যান অতিমাত্র খেয়ালী। জামাতাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না, কারণ, তিনি নিজে বোর্বো রাজার অনুরক্ত, এদিকে জামাতা হল বোনাপার্টির ভক্ত।

তিনি জামাতাকে বললেন—"আমি মেরায়াসের সকল ভার নিতে রাজী আছি, যদি তুমি স্বত্ব ত্যাগ করে ছেলে আমাকে দিয়ে দাও। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না, ওর সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারবে না, এমন কি, তুমি যে বেঁচে আছ, সে কথাও ওকে জানতে দিতে পারবে না। এতে যদি তুমি স্বীকৃত

থাকো, বল, আমি মেরায়াসের দায়িত্ব থেকে তোমাকে চিরতরে মুক্তি দিচ্ছি।"

পণ্টমার্সি প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, প্রত্যাখ্যান করতেই যাচ্ছিলেন এ-প্রস্তাব। কিন্তু তারপরই তিনি চিন্তা করতে বসলেন। শ্বশুরের প্রস্তাব তাঁর পক্ষে খুব অবমাননাজনক বটে, কিন্তু তা বলে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি মেরায়াসের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা দিতে পারেন না। গিলেনরম্যান ওকে ভালভাবে খাইয়েদাইয়ে মানুষ করতে পারবেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, পণ্টমার্সি এসব তো কিছুই করতে পারবেন না। অর্থ নেই তাঁর, নিজের রুটির সংস্থানই নেই। ছেলের ভার নিজের ওপর রাখলে সেই ছেলেরই সর্বনাশ করা হবে।

অশ্রু দমন করে অতঃপর পণ্টমার্সি শ্বশুরের হাতেই সমর্পণ করলেন শিশুপুত্রকে। সেই থেকে গিলেনরম্যানের গৃহেই প্রতিপালিত হচ্ছে মেরায়াস। পরম যত্নেই প্রতিপালিত হচ্ছে। অর্থের অভাব নেই গিলেনরম্যানের। মেরায়াসের মা-ই ছিলেন বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান। তাঁর অবর্তমানে এখন মেরায়াসই একমাত্র উত্তরাধিকারী বৃদ্ধের। ধনীর দুলালের মতই পরম আরামে দিন কাটছে তার। শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত হয়েছে। মেরায়াস ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করল।

পিতা? তার পিতার সম্বন্ধে কখনও কোন প্রসঙ্গ ওঠে না গিলেনরম্যানের গৃহে। কী জানি কেমন করে গিলেনরম্যান একটা ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছেন মেরায়াসের মনে যে, নেপোলিয়ঁা ছিল একটা পরস্বাপহারী দস্যু, এবং পণ্টমার্সি, তার পিতা, ছিল সেই দস্যুরই বিবেকহীন অনুচর। বিবেকবান সুনাগরিকের অন্তরের শ্রদ্ধা লাভ করবার যোগ্যতা—নেপোলিয়ঁা বা পণ্টমার্সি কারও ছিল না। কাজেই একটা দেশদ্রোহী রাজদ্রোহীকে মেরায়াস কেন যাবে শ্রদ্ধা করতে? বিশেষ যখন নিজের পুত্রের ভরণপোষণ
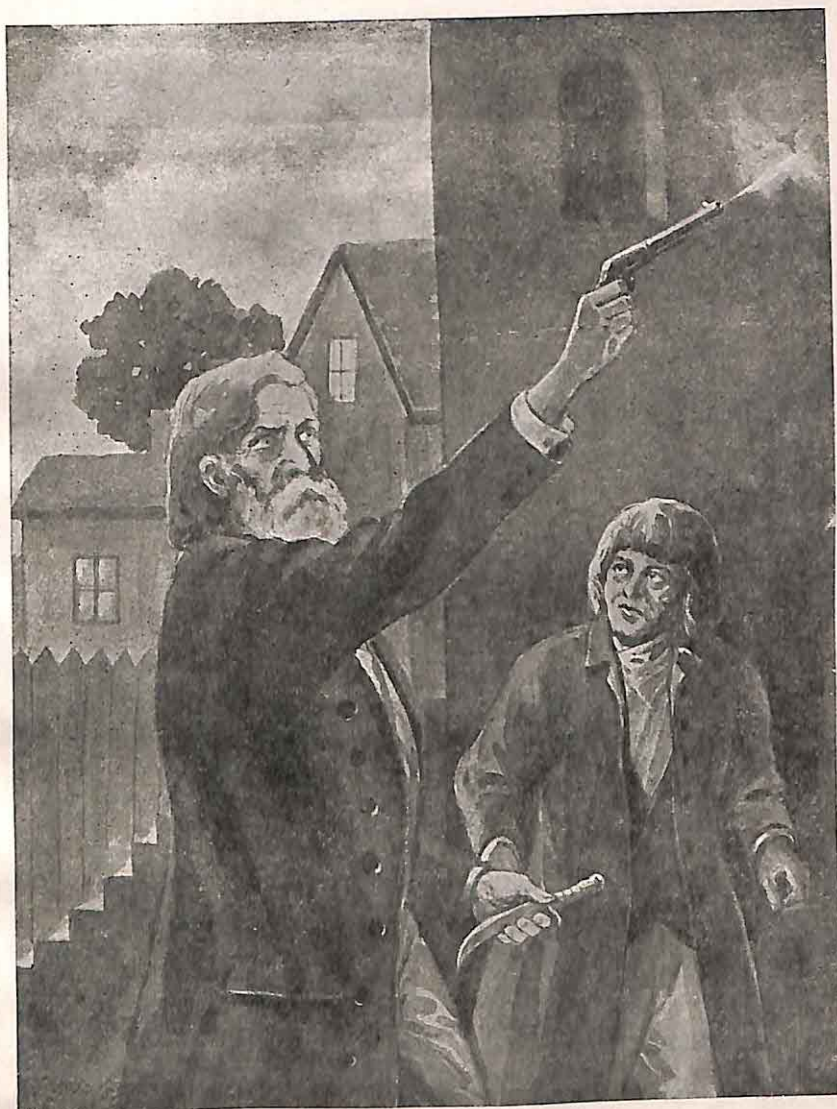
কোমর থেকে পিস্তল নিয়ে আকাশে তাক করে সে গুলি ছুড়ল।

শিক্ষার দায়িত্ব অন্যের ওপরে ফেলে দিয়ে সে একটা জঘন্য নীচতার পরিচয় দিয়েছে?

অতএব অবস্থা দাঁড়িয়েছে এইরকম যে মেরায়াস যখন তরুণ যুবক, তখন পর্যন্ত পিতাকে সে চোখে দেখে নি।

এমনি সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা গিলেনরম্যান তাকে জানালেন ডিনারের টেবিলে বসে—তার পিতা খুব পীড়িত, তার একবার যাওয়া দরকার তাকে দেখতে।

মেরায়াস বিস্মিত হল। যে মাতামহ তার পিতার নাম কখনও উচ্চারণ করেন না, তিনি তাকে সশরীরে যেতে বলছেন সেই পিতার কাছে? এমনটা কেমন করে হল?

আসল কথা এই যে—পন্টমার্সি শুধু পীড়িত নন, তিনি মৃত্যু-শয্যায়। মৃত্যু আসন্ন জেনে শ্বশুরের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন—মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকে একবার তিনি দেখতে চান। সারা জীবন পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন গিলেনরম্যান, কিন্তু মুমূর্ষুর এ মিনতি অগ্রাহ্য করতে তাঁর বিবেকে বাধল। তাই তিনি মেরায়াসকে বললেন—"তোমার পিতা পীড়িত, তাকে একবার দেখতে যাও।"

সে রাত্রে আর যাওয়া সম্ভব হল না, পরের দিনও খুব সকালে যাওয়ার কোন তাগিদ অনুভব করল না মেরায়াস। পিতার প্রতি কোন আকর্ষণ তো তার নেই। সে বাঁচুক আর মরুক, তাতে কী এসে যায় মেরায়াসের?

প্রাতরাশ সেরে, আরও কিছু কিছু জরুরী কাজ সমাধা করে মেরায়াস যখন মাতামহ-দত্ত ঠিকানায় গিয়ে হাজির হল, তখন পন্টমার্সি মারা গিয়েছেন। কাজেই, মৃত পিতার অন্ত্যেষ্টির সময় উপস্থিত থাকা ছাড়া মেরায়াসকে কিছুই আর করতে হল না।

অন্ত্যেষ্টির পর, যে বাড়ির একটা সৌষ্ঠবহীন কক্ষে পন্টমার্সি এতদিন বাস করেছিলেন, সেই বাড়ির মালিক মেরায়ারের হাতে

এনে দিল তার পিতার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র। অতি সামান্য জিনিস সে সব। মেরায়াস তা নিয়ে করবে কী? গরিবদুঃখীদের ডেকে বিলিয়ে দিল। রাখল কেবল একখানি চিঠি আর একখানি ডায়েরি।

চিঠিখানি পণ্টমার্সি লিখে গিয়েছেন মেরায়াসকে। তার ছত্রে ছত্রে কী ব্যাকুল স্নেহ ফুটে উঠেছে! মেরায়াসের এই প্রথম উপলব্ধি হল যে তার ওই পিতা, লোক যতই খারাপ হোন না কেন, পুত্রের প্রতি স্নেহের অভাব তাঁর ছিল না।

পত্রের শেষে একটা ছোট্ট অনুরোধ ছিল—"ওয়াটার্লু যুদ্ধে একটি সার্জেণ্ট আমার জীবন রক্ষা করেছিল। আমি তার কোন উপকারই করতে পারি নি। তুমি যদি পার, পিতৃ-ঋণ শোধ করো। নাম তার থিনাডিয়ার।"

এ ব্যাপারটাকে তখনকার মত বিশেষ গুরুত্ব দিল না মেরায়াস। পিতার অন্তিম চিঠিটা পড়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তাই বেড়াতে বেড়াতে দরিদ্র-পল্লীর ছোট্ট গির্জাটিতে গিয়ে উপস্থিত হল সান্ত্বনা-লাভের আশায়।

দৈবক্রমে ঠিক সেই জায়গাটিতেই সে গিয়ে দাঁড়াল, যেটি ছিল কাল পর্যন্ত ব্যারন পণ্টমার্সির নির্দিষ্ট স্থান। গির্জায় এলেই সেইখানে গিয়ে তিনি দাঁড়াতেন, সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি প্রার্থনা করতেন, চোখের জল ফেলতেন। বহু বৎসর ধরে স্থানের নড়চড় হয় নি তাঁর কোনদিন।

মেরায়াসকে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গির্জার তত্ত্বাবধায়ক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, করুণ হাসি হেসে বলল—"আজ আপনার ওখানে দাঁড়ানোতে কোনই বাধা নেই আর, কিন্তু তিন দিন আগেও ও-স্থানের একজন নির্দিষ্ট অধিকারী ছিল, ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর থেকে এই এতগুলো বৎসরে এমন একটি দিনও যায় নি, যেদিন তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলেন নি!"

ওয়াটার্লু যুদ্ধ? চোখের জল?

মেরায়াস আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল সেই লোকটির বিবরণ।

তত্ত্বাবধায়ক দ্বিরুক্তি না করে বলে গেল সব কথা। সে লোকটির নাম ছিল পণ্টমার্সি। পদবীতে কর্নেল, উপাধিতে ব্যারন। উপাধিটি অবশ্য সম্রাট্ নেপোলিয়ঁার দেওয়া, বোর্বো রাজা তা কখনও স্বীকার করে নি।

অশ্রু?—পণ্টমার্সির পুত্র ছিল একটি। সৈন্যবাহিনী থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার দরুন তিনি নিদারুণ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হন, কাজেই পুত্রকে কাছে রাখতে পারেন নি। কিন্তু পুত্রকে ভালবাসতেন প্রাণের অধিক। নিত্য এইখানে এসে ভগবানের চরণে পুত্রের মঙ্গল কামনা করতেন, আর মনোবেদনায় অশ্রু বর্ষণ করতেন।

কেন মনোবেদনা?—পুত্রকে যার হাতে সমর্পণ করেছিলেন, সেই নিষ্ঠুর বৃদ্ধ জীবনে কখনও দরিদ্র-পিতাকে পুত্রের কাছে ঘেঁষতে দেয় নি!

মেরায়াসের চোখের সামনে অবহেলিত পিতার চরিত্রের একটা নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে সে পিতার ডায়েরিখানি খুলে পড়তে লাগল। তাতে পাতায় পাতায় দুটিমাত্র কথার নানাভাবে পুনরুক্তি। দুটি কথা, দুটি প্রাণঢালা অনুরাগ। একটি তাঁর দেশের প্রতি, অন্যটি তাঁর পুত্রের প্রতি।

মেরায়াস মুগ্ধ হয়ে গেল। দেশকে যে এমন ভালবাসত, সে কি দেশদ্রোহী নাম পাবার যোগ্য? তার চিন্তাধারা আগাগোড়া ওলটপালট হয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে নেপোলিয়ঁার আমলের সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে সে গিয়ে দেখা করতে লাগল একে একে। তাঁরা সবাই এখন অবসরপ্রাপ্ত, পণ্টমার্সির মত তাঁদেরও ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল ওয়াটার্লুর পরে।

তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে পণ্টমার্সির অশেষ প্রশংসা শুনল

মেরায়াস। অমন বীর, অমন সাহসী, অমন ন্যায়নিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সে-যুগে কমই ছিল। সাধে কি সম্রাট নেপোলিয়ঁা তাঁকে ব্যারন উপাধি দিয়েছিলেন? নেপোলিয়ঁার পরাজয় না হলে পণ্টমার্সি নিশ্চয়ই সৈন্যবাহিনীতে উচ্চতম পদের অধিকারী হতে পারতেন। গত যুগের এই সব বীর সৈনিকের সঙ্গে আলাপে আলোচনায় আরও এক দিক দিয়ে গুরুতর একটা পরিবর্তন এসে গেল মেরায়াসের চরিত্রে। শুধু যে তার পিতৃভক্তি ফিরে এল, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এল সম্রাট নেপোলিয়ঁার ওপরে অনুরক্তি। তিনি যে কত বড় বীর ছিলেন, ফরাসীদেশকে তিনি যে কত ভালবাসতেন, ফরাসীদেশকে মহত্ত্বের কত উচ্চতম শিখরে যে তিনি উন্নীত করেছিলেন, তাই বর্ণনা করতে করতে এই সব পলিতকেশ সেনাপতিরা শ্রদ্ধায় অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন যখন, সেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের খানিকটা ছোঁয়াচ লাগত মেরায়াসেরও অন্তরে। ক্রমে ক্রমে সেও পুরোদস্তুর অনুরাগী হয়ে উঠল নেপোলিয়ঁার!

এখন বৃদ্ধ গিলেনরম্যান চিরদিন বোর্বো-ভক্ত এবং কাজে কাজেই নেপোলিয়ঁা চিরদিন তাঁর চক্ষুশূল। যতদিন নেপোলিয়ঁা ক্ষমতাসীন ছিলেন, ততদিন রাজধানী থেকে নিরাপদ দূরত্বেই তিনি অবস্থান করতেন। এখন তিনি সেই নির্বাসনের ঝাল ঝাড়ছেন সময়ে অসময়ে সর্বদা নেপোলিয়ঁার নিন্দাবাদ করে।

এতদিন মেরায়াসও তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গিয়েছে বিনা দ্বিধায়। কিন্তু ইদানীং সে আর তা পারছে না। বিবেকে বাধছে তার। সে আর একথা বিশ্বাস করে না যে নেপোলিয়ঁা অত্যাচারী বা শোষক ছিলেন, নেপোলিয়ঁা ফরাসীদেশকে দুর্গতির অতলে ডুবিয়ে গিয়েছেন।

বিশ্বাস যখন করে না, তখন বিনা প্রতিবাদে গিলেনরম্যানের নিন্দাবাদে সায় দেওয়া তো তার পক্ষে ভণ্ডামি হয়! সে-ভণ্ডামি মেরায়াসের ধাতুতেই নেই। একদিন সে গিলেনরম্যানের কথার প্রতিবাদ করে বসল স্পষ্টভাষায়।

গিলেনরম্যান তো চক্ষু বিস্ফারিত করে ফেললেন বিস্ময়ে। যে মেরায়াসকে তিনি জানতেন একান্তভাবে বোর্বো-ভক্ত নেপোলিয়ঁা-বিদ্বেষী, তার এ কী পরিবর্তন ? তিনি সরোষে বললেন—"তুমি যদি এইসব মতবাদের সমর্থক হও, তাহলে এ-গৃহে তোমার স্থান হবে না। রাজনীতির দিক দিয়ে মতের অমিল ছিল বলে তোমার পিতার মুখ-দর্শন করি নি কোনদিন, তোমারও করব না।"

মেরায়াসও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল বৃদ্ধের একগুঁয়েমি এবং অবিচারে, বিশেষ করে তার মৃত পিতার সম্বন্ধে এ-রকম তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যে সেও রেগে উঠে বলল—"আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি আপনার বাড়ি থেকে।"

সত্যিই সে গৃহত্যাগ করে উঠল গিয়ে এক ছাত্রাবাসে। সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছে। কাজেই সহাধ্যায়ী কোর্ফেরাকের ঘরেই সে স্থান পেল একটু।

গিলেনরম্যানের রাগ ওদিকে পড়ে এল। সংসারে মেরায়াস ছাড়া তাঁর অপর কেউ নেই। প্রাণের চেয়েও তিনি ভালবাসেন ওকে। ও যে তাঁকে ছেড়ে যাবে, তা কোনদিন তিনি ভাবতে পারেন নি। গৃহ ফাঁকা লাগে, জীবন মনে হয় অর্থশূন্য। দু-চার দিন অসহ্য মনঃকষ্টে কাটিয়ে অবশেষে তিনি বেয়াড়া নাতিটাকে খবর পাঠালেন—"ফিরে এসো। আমি ক্ষমা করব তোমাকে।"

মেরায়াস তখনও রেগে আছে, কারণ গিলেনরম্যান শুধু তাকেই অপমান করেন নি, করেছেন তার পিতাকে, এবং সম্রাট নেপোলিয়ঁা-কে। সে উদ্ধতভাবে জবাব পাঠাল—"আমি আর ফিরব না ও-ঘরে। ক্ষমা আমি চাই না।"

তারপর গিলেনরম্যান অর্থ পাঠাতে লাগলেন মেরায়াসকে। সে অর্থ ফেরত যেতে শুরু করল। দু চারবার ফেরত আসবার পরে বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ নিরস্ত হলেন। কিন্তু মেরায়াস তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছে, মেরায়াস কষ্ট পাচ্ছে অর্থাভাবে, এই চিন্তায়

রাজকীয় বিলাসের মধ্যে বাস করেও তিনি মনে মনে দগ্ধে মরতে লাগলেন।

মেরায়াসের চলে কিভাবে? সে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখে। দেশের রাজনীতিতে তখন ঝড় উঠেছে একটা। বোর্বোরা যে অপদার্থ, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে। দেশের লোক আত্ম-জিজ্ঞাসা শুরু করেছে—"নেপোলিয়ঁার স্থলে একী মোমের পুতুলদের আমরা এনে বসিয়েছি?"

দেশে ছোটখাটো রাজদ্রোহের ঘটনা ঘটছে। গরম গরম লেখা কাগজে কাগজে, গরম গরম বক্তৃতা সভায় সভায়, সময়ে সময়ে রাজপথে সামান্য সংঘর্ষও পুলিসে ও নাগরিকে। বলা বাহুল্য, এ সব নাগরিকের অধিকাংশই ছাত্র। যে কোন দেশে যে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের পুরোভাগে স্থান নিয়েছে চিরদিনই এই দুঃসাহসী ছাত্রসমাজ।

দুটি মাত্র কাজ মেরায়াসের—ঘরে বসে প্রবন্ধ লেখা, আর আইন কলেজে গিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে রাজনীতির জটলা করা। এই দুইয়ের ফাঁকে বিকালবেলায় সে একবার পার্কে হাজিরা দেয়। পল্লীর পার্কে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন কিছু সমারোহ আছে তা নয়। তবে ইদানীং কিছুদিন রোজই সন্ধ্যার দিকে পার্কের বেঞ্চে একটি শুক্লকেশ বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা যায় একটি স্বর্ণকেশী কিশোরীকে।

মেরায়াস জানে না, কিন্তু এই স্বর্ণকেশী কিশোরীর নাম কোজেৎ, এবং এই শুক্লকেশ বৃদ্ধের নাম মসিয়ঁ ফকলেভেণ্ট ওরফে মসিয়ঁ মাদেলিন ওরফে জাঁ ভ্যালজাঁ।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে জাঁ ভ্যালজাঁ লোকালয়ে দেখা দিয়েছে।

*　　*　　*　　*

মণ্টপেলিয়ার থেকে কোজেৎকে নিয়ে যখন বেরুলো জাঁ ভ্যালজাঁ —সেই দশ বৎসর আগে তখন একটি শত্রু সে পিছনে রেখে এল।

সে শত্রু হল থিনার্ডিয়ার। ফাতাঁইনের টিপসইযুক্ত চিঠি সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না, যদি না জাঁর হাতে থাকত অমন একটা লোহা-বাঁধানো মোটা লাঠি। নির্জন বনভূমিতে ওই ষণ্ডামার্কা লোকটার সঙ্গে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়ার সাহস তার হল না।

লোকালয়ে ফিরে এসেই সে গন্ধ পেল—ঐ ষণ্ডামার্কার সম্বন্ধে তদন্ত করছে পুলিস! সে কালবিলম্ব না করে ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করল এবং জাঁর সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্বন্ধে যা তার জানা ছিল, প্রচুর পরিমাণে পল্লবিত করে তা জানিয়ে দিল।

বলা বাহুল্য এই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম জ্যাভার।

তারপর শুরু হল মনুষ্যমৃগয়া। জাঁ ভ্যালজাঁর পেছনে পেছনে একটা গোটা পুলিসবাহিনীর অভিযান। শহর ছেড়ে গ্রামে, বন ছেড়ে পাহাড়ে, নদীনালা পেরিয়ে শিকারী ছুটছে শিকার ধরবার জন্য।

একটা পুল পার হয়ে এল জাঁ ভ্যালজাঁ। সঙ্গে সঙ্গে পুলের ওমাথায় লাফিয়ে উঠল পুলিস। জাঁ ভ্যালজাঁ সভয়ে তাদের দিকে তাকাতেই পুলিস দলে উঠল বিজয়োল্লাস; জাঁর পিঠে বসে ছিল আট বছরের কোজেৎ, সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—"ওরা কারা বাবা?"

কোজেৎ এই দু দিনেই জাঁকে বাবা বলে ডাকতে শুরু করেছে। শিশু যদি ভালোবাসা পায়, তাহলে তাকে আর শিখিয়ে দিতে হয় না যে কাকে কি বলে ডাকতে হবে।

কোজেতের প্রশ্নের উত্তরে জাঁ বলল—"ওরা থিনার্ডিয়ারের লোক তোমায় আবার কেড়ে নিতে আসছে। তা, তোমার কোন ভয় নেই। আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নিতে পারে, এমন শয়তান নরকে একটাও নেই।" বলতে বলতে জাঁ ছুটেছে ক্রমাগত। একটা গলির ভেতর ঢুকল সে! ডাইনে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা একটা বিস্তীর্ণ বাগান, বাঁয়ে বহুতলা উঁচু বড় বড় বাড়ি। পেছনে জ্যাভার।

তীরবেগে ছুটে গলিটা অতিক্রম করে বড় রাস্তায় পড়ল জাঁ। কী সর্বনাশ। সামনেই দ্বিতীয় একদল পুলিস। সে ঝটিতি পেছুলো আবার। এবার? ইঁদুর খাঁচায় পড়েছে।

কিন্তু জাঁ দমল না। একা হলে সে ওই বহুতলা উঁচু বাড়ির যে কোন একটাতে খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠে যেত। কিন্তু পিঠে কোজেৎকে নিয়ে সে দুঃসাহস সে করতে পারে না। কোজেৎ যদি পড়ে যায়? সর্বনাশ!

উঠতে হবে ওই বাগানের দেয়ালে। কিন্তু সে দেয়ালও খাড়া। কী করে ওঠা যাবে?

সামনেই রাস্তার আলো একটা। তখনকার দিনে প্রত্যেক আলোর মাথায় একটা খুপরি থাকত আর সেই খুপরিতে থাকত একগাছা করে লম্বা দড়ি। কোথাও আগুন লাগলে যাতে হাতের কাছে দড়ি পাওয়া যায় ওপরে ওঠবার জন্য, তারই জন্য দমকলের লোকদের ব্যবহারে লাগবে বলে এইসব দড়ি রাখা হত।

আংটাওয়ালা সেই দড়ি দেয়ালের মাথায় ছুঁড়ে মেরে, তাই বেয়ে জাঁ ওপিঠের বাগানে গিয়ে পড়ল। আর পরের মুহূর্তেই গলি বেয়ে ছুটে চলে গেল জ্যাভারের পল্টন। পাঁচিলটার ওপারেই যে তাদের শিকার দুরুদুরু বক্ষে অবস্থান করছে তখন, তা তারা কেমন করে জানবে? অত উচু পাঁচিলে তো কাঠবিড়ালীও উঠতে পারে না।

জাঁ ভেতরে ঢুকতেই তার দেখা হয়ে গেল একটি বুড়ো মালীর সঙ্গে। সে মালী সেই ফকলেভেন্ট, নিজের জীবন বিপন্ন করে একদা মেয়র মাদেলিন যার জীবন রক্ষা করেছিলেন। সে তো হঠাৎ সেই জীবনদাতা দেবতাকে সামনে দেখে বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ল একেবারে।

বাগানের ভেতর সন্ন্যাসিনীদের এক মঠ। ওই বুড়ো মালী ভিন্ন অন্য পুরুষ মঠে নেই। মালীরই ভাই পরিচয়ে, তারই সুপারিশে

জাঁ সহকারী মালীরূপে নিযুক্ত হল মঠে। কোজেৎ ভরতি হল মঠের বিদ্যালয়ে।

সেইখানে নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনযাপন দীর্ঘ দশ বৎসর। সন্ন্যাসিনীদের মঠে পলাতক দস্যুকে খোঁজবার কথা পুলিসের মনে হয় নি!

দশ বৎসর কাটল। কোজেৎ এখন অষ্টাদশী সুন্দরী। সে হয়তো স্বভাবতঃই সন্ন্যাসিনীর জীবনই গ্রহণ করত ওই মঠে। কিন্তু জাঁর তা পছন্দ হল না। কোজেৎকে সংসারের স্বাদ পেতে দেওয়া উচিত। তারপর সে যদি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নেয় তো নেবে।

আট

পৃথিবীর সাথে কোজেৎ যাতে পরিচিত হতে পারে, গার্হস্থ্যজীবন আর সন্ন্যাস দুটোর স্বাদই যথাযথ পাওয়ার পরে নিজে বিচার করে যাতে একটা বেছে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই জাঁ ভ্যালজাঁ তাকে নিয়ে প্যারী এসেছে। এ আসা যে তার নিজের পক্ষে কত বিপজ্জনক, তা সে না বোঝে, এমন নয়। মঠের চার দেওয়ালের ভেতর সে ছিল একান্ত নিরাপদ, জ্যাভারের মত শ্যেনদৃষ্টি গোয়েন্দাও দীর্ঘ দশ বৎসরের ভেতর সন্দেহমাত্র করতে পারে নি যে অমন একটা জায়গাতে লুকিয়ে থাকতে পারে একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডা। জাঁকে সে তো গুণ্ডা বদমাইস বলেই জানে।

সেই পরম নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে খোলা রাস্তায় এসে আবার দাঁড়িয়েছে জাঁ ভ্যালজাঁ কোজেতের মঙ্গলকামনায়। এখানে পদে পদে ধরা পড়বার আশঙ্কা, ধরা পড়লেই সারা জীবন আর সে দেখতে পাবে না কোজেৎকে। তবু, সব জেনেও সে এসেছে। কারণ নিজের জীবনটা বলি দিয়েও কোজেৎকে সুখী করতে সে ব্যগ্র।

প্যারীতে এসে মহানগরীর তিন কোণে তিনটে বাড়ি ভাড়া

করেছে জাঁ। তিনটি বাড়িই অতি নিভৃত পল্লীতে। কোনটাতেই একসঙ্গে বেশীদিন সে বাস করে না। এটাতে একমাস, ওটাতে পনেরো দিন, ক্রমাগত বাসস্থান পালটাচ্ছে।

সারাদিন সে বাড়ি থেকে বার হয় না। সন্ধ্যার দিকে একটিবার মাত্র কোন পার্কে গিয়ে বসে কোজেৎকে নিয়ে। সদাই সতর্ক দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে আছে—কোন্ পথ দিয়ে জ্যাভার এসে অতর্কিতে হাজির হয় সামনে।

কোজেৎ ওই সন্ধ্যার এক ঘণ্টা ঘুরে ফিরে বেড়ায় পার্কের ভেতরে। সাধারণ অবস্থায় এইটুকু সময়ের ভেতরে সংসারের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় কারোই ঘটতে পারে না। জাঁ বোঝে তা। কিন্তু সে করবে কী? নিজে সে কোন ভদ্র পরিবারে পরিচিত নয়। কোজেৎকে সে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে হাজির করবার সুযোগ পাবে কী করে? এ-অসুবিধার জন্য সে আন্তরিক পরিতপ্ত। কিন্তু উপায় নেই। তার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল, তা সে করেছে। বাকীটার ভার ভগবানের ওপর। অবশ্যই ভগবান একটা উপায় করবেন।

উপায় করলেনও ভগবান। কোজেৎ দেখল মেরায়াসকে। মেরায়াস দেখল কোজেৎকে। জাঁও দেখল দুজনের স্বল্পকালীন মেলামেশা। এ দুটিতে যদি জুটি বাঁধে, মানায় ভাল।

কিন্তু সংসারের ওপর দারুণ অবিশ্বাসও আছে জাঁর। মানুষ সবাই সৎ নয়। বলতে গেলে বেশির ভাগ মানুষই অসৎ। মেরায়াস পছন্দ করছে কোজেৎকে, এটা বোঝা যায়। কিন্তু সে-পছন্দটা কতখানি গভীর? কতদিন স্থায়ী হবে?

সেইটিই আসল সমস্যা। তারই ওপরে নির্ভর করছে সব কিছু। এমনি যদি হয় যে মেরায়াসের এ একটা দুদিনের খেয়াল মাত্র তাহলে এ-সংস্রব যত শীঘ্র ছিন্ন করে দেওয়া যায়, ততই ভাল। বিলম্বে কোজেতের মানসিক শান্তি হবে বিপন্ন।

কিন্তু পরীক্ষা না করে তো নিশ্চিত হওয়া যায় না যে কী মেরায়াসের প্রকৃত উদ্দেশ্য? বিবাহ, না, অন্য কিছু? বিবাহ যদি হয়, তাহলে জাঁর আপত্তি নেই। ছেলেটি সুরূপ, স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান, তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থ? না থাকে, নেই! কোজেতের নিজের অর্থ আছে। জাঁর ছয়লক্ষ ফ্রাংক সবই প্রায় মজুত রয়েছে এখনও। সবই কোজেৎ পাবে। কাজেই তার স্বামী দরিদ্র হলেও ক্ষতি হবে না।

জাঁ মনস্থ করল—পরীক্ষা নিতে হবে। সে হঠাৎ বাড়ি বদলে শহরের অন্য প্রান্তে চলে গেল।

কোজেৎ দুদিন খুব ম্রিয়মাণ। তৃতীয়দিন কিন্তু জাঁ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তার মুখে মৃদু হাসি ফুটেছে আবার। পল্লীর পার্কে যেতেই দেখা গেল সেই আইন-পড়ুয়া মেরায়াস এখানেও হাজির।

এই রকম বারে বারে বাড়ি পালটায় জাঁ। কিন্তু মেরায়াস সঙ্গ ছাড়ে না। কয়েক মাস চলল এই রকম। জাঁর মনে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাল ছেলেটি হয়তো খাঁটী, চপল প্রজাপতি নয়।

* * *

শহর গরম হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অশান্তি ধিকিধিকি জ্বলছিল এতদিন, হঠাৎ লেলিহান শিখা মেলে দিগন্ত স্পর্শ করতে চাইছে। বোর্বোপন্থী আর বোর্বোবিরোধীরা আর রাজী নয় বক্তৃতা বা প্রবন্ধের ভেতরে নিজেদের রেষারেষিকে সীমাবদ্ধ রাখতে। বোর্বোবিরোধীরা চায় বর্তমান শাসনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। তারা শক্তি-পরীক্ষায় নেমে পড়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে। অস্ত্র নেই, লোকবল নেই, নেই অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন, তবু তারা লড়ে দেখবে একবার।

বিরোধীরা প্রায় সবাই ছাত্র। তাদের নেতার নাম এঞ্জোরাস। মেরায়াসের বন্ধু কোর্ফেরাক আছে এ দলে। আছে মেরায়াসও।

এই মুহূর্তে মেরায়াস এই মৃত্যুপণ সংঘর্ষে যোগ দেবে—এটা

আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু যোগ দেবার কারণ আছে। কোজেতের সঙ্গে তার মিলনের কোন আশা সে দেখতে পাচ্ছে না। কোজেতের বাবা মসিয়ঁ ফকলেভেন্ট অনবরত লুকোচুরি খেলছেন, এ-পাড়া ছেড়ে ও-পাড়ায় পালাচ্ছেন, ও-পাড়া ছেড়ে সে-পাড়া। এর তাৎপর্য্য কী হতে পারে? নিশ্চয়ই এই যে তিনি মেরায়াসের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চান না।

তারপর মসিয়ঁ গিলেনরম্যান মেরায়াসের মাতামহ। মেরায়াস ঝগড়া করে তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ করতে পারে না। আইনতঃ সেটা অসিদ্ধ, কার্য-ক্ষেত্রেও অসুবিধাজনক। মেরায়াসের নিজের এক ফ্রাংক সম্বল নেই। গিলেনরম্যানের অর্থসাহায্য নিজের জন্য মেরায়াস নেয় না, কিন্তু বিবাহ করতে হলে সে সাহায্য না নিলে চলবে কেন? কোজেতের যে নিজের অর্থ আছে, তা তো সে জানে না।

গিলেনরম্যানকে সে চিঠি লিখেছিল। তিনি বলেছেন—আগে মেরায়াস তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করুক, নেপোলিয়ঁকে পরস্বাপহারী দস্যু বলে মেনে নিক, তারপর তার বিবাহের কথা তিনি বিবেচনা করবেন।

মেরায়াস ঘৃণাভরে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেচে।

তাহলে আর বিবাহের আশা কী আছে?

আর বিবাহের আশাই যদি না থাকে, তবে জীবনধারণের প্রয়োজনই বা কী?

ছাত্রসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে গৃহযুদ্ধে। মেরায়াস মরিয়া হয়ে তাতেই যোগ দিল।

প্রতিরোধ? সংঘর্ষ? না, ওসব পর্যায় ছাড়িয়ে, কলহটা এখন পুরোদস্তুর গৃহযুদ্ধেই পরিণত হয়েছে। অবশ্য একদিকে সরকারের সমগ্র শক্তি, সুসজ্জিত সৈন্যদল, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সজ্জা, এবং অন্যদিকে গুটি পঞ্চাশ যুবক, যাদের কারও বয়সই পঁচিশের ঊর্ধ্বে নয়

বা সামরিক শিক্ষা যারা একদিনের জন্যও পায় নি। কিন্তু তাতে হল কী? যুদ্ধ এটা, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। মুষ্টিমেয় এই যুবক কয়টি প্রাণ দেবার জন্যই এসেছে। মেষের মত জবাই হবার জন্য নয়, প্রাণ নিয়ে তারপর প্রাণ দেবার জন্য। রাতারাতি দেশের সরকার পালটে দিতে পারবে, এমন দুরাশা তারা করছে না; কিন্তু দেশব্যাপী বিপ্লব যাতে গজিয়ে উঠতে পারে, তারই ক্ষেত্র তারা তৈরি করে যেতে সক্ষম হবে, এটুকু আশা তারা করছে বই কি।

শস্য উৎপাদনের জন্য সেচন করতে হয় জল, বিপ্লব সৃষ্টির জন্য ঢালতে হয় রক্ত! সে-রক্ত ঢালতে তারা জনে জনে তৈরী। ফরাসী রাজধানী প্যারী মহানগরীর বুকে রু্য-দ্য-চ্যানবেরি একটা নগণ্য রাস্তা, যেমন সরু আর ঘিঞ্জি, তেমনি নোংরা আঁকোবাঁকা। এই রাস্তাটার ওপরে ঘাঁটি স্থাপন করেছে বিপ্লবীরা!

করেছে—তার কারণ আছে। রাস্তাটা সরু, তার একপাশে একটা ছয়-তলা বাড়ি, একপাশে একটা দোতলা হোটেল। হোটেলটাই বিপ্লবীদের কেল্লায় পরিণত হয়েছে। সরু পথটার সামনের দিকে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে ওলটানো গাড়ি, খালি পিপে, বালির বস্তা—যা-কিছু হাতের মাথায় পাওয়া গিয়েছে, তাই দিয়ে। নিতান্ত হেলাফেলার জিনিস হয় নি দেয়ালখানা, একটা একতালা বাড়ির সমান উঁচু অন্ততঃ। যেমন উঁচু, তেমনি পুরু। সাধারণ বন্দুকের গুলির পক্ষে সে-দেয়াল তো দুর্ভেদ্য বটেই, ছোট্ট-খাট্টো কামানও হঠাৎ তাকে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

এই দেয়ালের একপাশ দিয়ে এক ফুট চওড়া একটু রাস্তা আছে বিপ্লবীদেরই সুবিধার জন্য। রাজসৈন্য সেই এক ফুট সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে, এমন সম্ভাবনা নেই। একজনের বেশী তো একসাথে ঢুকবার পথই নেই। আর এক একজন করে ঢুকতে গেলে এদিককার পঞ্চাশজনের হাত থেকে পঞ্চাশটা গুলি একসাথে ছুটে গিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ খতম করে দেবে না?

রাস্তার পেছন দিকটা খোলা আছে। এদিকে যেসব লোক, বাস করে, তারা একান্ত অনুগত বিপ্লবীদের। তা ছাড়া শহরের সভ্য অঞ্চল থেকে সৈন্যদল এলে সামনের দিক দিয়েই তাদের আসতে হবে, পেছন দিক দিয়ে হানা দেবার চেষ্টা করতে হলে ঘুরে আসতে হবে আদ্ধেকটা শহর।

বিপ্লবীরা জানে, তারা সবাই ছাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাদের ভেতর এমন ছ চার জন লোক দেখা যাচ্ছে, যারা ছাত্র নয়। বলতে গেলে অপরিচিতই তারা। কেন তারা এসেছে? জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—"দেশের জন্য লড়বার অধিকার কি কেবল ছাত্রদেরই একচেটিয়া ?"

আসলে এরা পুলিসের চর। এরা এসেছে গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়ার মতলবে। এরা আশপাশের নিরীহ নাগরিকদের ওপর অকারণে অত্যাচার করবে, দুর্নাম রটবে বিপ্লবীদের, তারা জন-সাধারণের সহানুভূতি হারাবে।

একটা ছোট ছেলে—সেও ছাত্র নয়। তবে ছাত্ররা অনেকে তাকে চেনে। প্যারীর রাজপথে সে চব্বিশ ঘণ্টার পথচারী। তার আহারবিহার শয়ন ও নিদ্রা সবই পথে পথে। মাঝে মাঝে ছোটখাট চুরিচামারিও করে, তবে ধরা পড়ে না কখনও। নাম তার গ্যাভ্রোচ।

মাদাম থিনাডিয়ারের একদা বাসনা ছিল—তার পুত্র হলে নাম রাখবে গ্যাভ্রোচ। কারণ কোনও এক মনোরম উপন্যাসে সে জনৈক মেক্সিকান মহাপ্রাণ বিপ্লবীর গল্প পড়ে একান্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল সেই সময়। মাদামের সে বাসনা পরে পূর্ণ হয়েছিল, এবং পুত্রের নাম সে গ্যাভ্রোচই রেখেছিল। এই সেই ছেলে। জ্ঞান হয়ে অবধি সে পিতামাতার আশ্রয় ছেড়েছে, কারণ পিতাপুত্র কেউ কাউকে পছন্দ করে না।

আজ সেই গ্যাভ্রোচ বিপ্লবীদের দলে জুটেছে। তাকে কেউ

সন্দেহ করছে না, কারণ সবাই জানে—ক্ষুধায় পীড়িত হলে চুরি অবশ্য গ্যাভ্রোচ করে, কিন্তু জীবন গেলেও বিশ্বাসঘাতকতা সে করবে না।

সেই গ্যাভ্রোচ এসে বিপ্লবী-নেতা এঞ্জোরাসের কানে কানে কী বলল, এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল একটা ঢ্যাঙ্গা লোককে—যে একা একা দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করছিল নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে।

গ্যাভ্রোচের কথা শুনে এঞ্জোরাস দীর্ঘপদক্ষেপে ঢ্যাঙ্গা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল—"তুমি কে? সত্য বল।"

লোকটা একটুও দ্বিধা না করে বলল—"মিথ্যা আমি কখনও বলি না। আমার নাম জ্যাভার।"

"কেন এসেছ এখানে?"

"কেন এসেছি, তা তো অনুমানই করেছ তোমরা। পালাবার পথ নেই, দেখতে পাচ্ছি। মেরে ফেলতে পার।"

"পরে দেখব"—বলে এঞ্জোরাস ইঙ্গিত করল বন্ধুদের। তারা জ্যাভারকে ধরে হোটেলের দোতলায় নিয়ে গেল এবং সেখানে একটা টেবিলের ওপর তাকে শুইয়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

এঞ্জোরাস বিনা প্রমাণে বা সামান্য কারণে কারও প্রাণ নিতে রাজী নয়। গ্যাভ্রোচ বলছে বটে যে জ্যাভার একটা গোয়েন্দা। সত্য নির্ণয় প্রমাণসাপেক্ষ। তার ওপর—গোয়েন্দা হওয়াই কিছু একটা অপরাধ নয়। গোয়েন্দারা তো রাষ্ট্রব্যবস্থারই অঙ্গবিশেষ। দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও তো পুলিস এবং গোয়েন্দা এখনকার মতই বজায় থাকবে। জ্যাভারকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখা যায় নি এখন পর্যন্ত। সুতরাং হঠাৎ ওর প্রাণদণ্ড হতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বা নিজের হাতেই অপরাধীর প্রাণ নিতে কাতর নয় এঞ্জোরাস। তার প্রমাণ প্রায় তক্ষুণি পাওয়া গেল। পুলিসের এক চর ওখানে এসেছিল। তার

নাম লিকে-বুক। সে মতলব করেই এসেছিল প্রতিবেশী গৃহগুলির সাথে বিপ্লবীদের বিরোধ বাধিয়ে দেবে। এসেই সে ছয়-তলা বাড়িটার দরজায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল।

কিছুক্ষণ গৃহবাসীরা নীরবে সহ্য করল এই উৎপাত। কিন্তু গুঁতো আর থামে না। অগত্যা ওপরের জানালা খুলে এক বৃদ্ধ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"কী চান আপনারা ?"

লিকে-বুক কর্কশস্বরে জবাব দিল—"দরজাটা খুলে দাও, আমরা ভেতরে আসব। আর কী চাইব ?"

বৃদ্ধ আরও ভীত হয়ে পড়ল। "সে কি করে হবে মশাই ? সে কি করে হবে ?"—বলতে বলতেই গুড়ুম করে গুলি ছুটল লিকে-বুকের বন্দুক থেকে। জানালার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ। একটা আর্তনাদ উঠল বাড়ির ভেতর।

এঞ্জোরাস সেই মুহূর্তেই নেমে এসেছে, জ্যাভারকে বেঁধে রেখে। গুলি ছুড়তে দেখেছে লিকে-বুককে। বৃদ্ধকে দেখলে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে। কাউকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল না। দীর্ঘপদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে লিকে-বুকের গলাবন্ধ চেপে ধরল। তার সেই টানাটানা চোখের কোণে বজ্রাগ্নি ঝলকাচ্ছিল যেন লিকে-বুক—সেই দুর্বৃত্ত গুণ্ডা হঠাৎ দারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে কোন প্রতিবাদ করতে পারল না, যখন এঞ্জোরাস তাকে সেইখানেই চেপে ধরে নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য করল।

শুধু তার মুখ থেকে কাতর অনুনয় শোনা গেল—"ক্ষমা, ক্ষমা !"

ক্ষমা ? এঞ্জোরাস যেন সিংহের মত গর্জন করে উঠল—অকারণে নরহত্যা করে তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা ? তুই শুধু নৃশংস নোস, কাপুরুষও।"

সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জোরাসের পিস্তল আগুন উদ্‌গিরণ করল, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে লিকে-বুকের মৃতদেহ।

ওদিকে রাজসৈন্য এসে পড়েছে। তারা পাঁচিলের ওধার থেকে

বন্দুক ছুড়ছে। বিপ্লবীরা অনেকেই রয়েছে পাঁচিলের মাথায়। সেখান থেকে গুলিবর্ষণ করে তারা রাজসৈন্যের অগ্রগতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। বাধা না দিলে তো তারা নির্বিবাদে এসে পাঁচিলের মাথায় উঠে পড়বে, এবং সেখান থেকে গুলি মেরে মেরে নিঃশেষ করে দেবে বিপ্লবীদের। বিপ্লবীরা মরতে প্রস্তুত নিশ্চয়ই। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব, লড়তে চায় তারা। যতগুলি সম্ভব শত্রুকে চায় নিপাত করতে। যাতে চ্যানবেরির যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়, তারা করে যেতে চায় সেইরকম কিছু একটা।

বিপ্লবীরা গুলি ছুড়ছে পাঁচিলের মাথা থেকে। রাজসৈন্যের ভেতর হতাহত কম হচ্ছে না। কিন্তু সৈন্য তো দু চারজন নয়, মেরে কত কমানো যায়? একটি সৈনিক মরলে অন্য আর একটি তৎক্ষণাৎ এসে তার স্থান গ্রহণ করছে। একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আর একটা দল পেছন থেকে এগিয়ে আসছে শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য।

কিন্তু রাজসৈন্যের গুলিতেও মরছে বিপ্লবীরা। গড়িয়ে পড়ছে হত এবং আহতদের রক্তমাখা দেহগুলি চ্যানবেরির চত্বরে। তারা যে-স্থানটুকু শূন্য করে ফেলে আসছে, তা আর পূরণ হচ্ছে না। পূরণ করবার মত অতিরিক্ত লোক তো এদের নেই।

এঞ্জোরাস দেখল—আর কয়েক মিনিট এইভাবে পাঁচিলের মাথায় যুদ্ধ যদি চলতে থাকে, তাহলে ওখানেই বিপ্লবীদের শেষ মানুষটি বীরশয্যা গ্রহণ করবে। কিন্তু ওরা যদি পশ্চাদপসরণ করে এখন, চ্যানবেরির পেছন দিকে দোতলা হোটেলটা আশ্রয় করে আরও বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। সে নীচে থেকে নির্দেশ দিল—"নেমে এস।"

নেমেই আসতে লাগল ওরা। হুড়মুড় করে নয়। ধীরে সুস্থে, শৃঙ্খলা বজায় রেখে। গুলিবর্ষণে মন্দা পড়তেই রাজসৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল, এবং আঁচড়-পাঁচড় কাটতে কাটতে উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়। ততক্ষণে বিপ্লবীরা প্রায় সবাই নেমে পড়েছে

বাকী আছে শুধু কোর্ফেরাক আর গ্যাভ্রোচ। তারা বুঝি আর নামতে পারে না। দুটো সৈনিক প্রকাণ্ড তরোয়াল তুলেছে তাদের মাথা কেটে নামাবার জন্য।

চ্যানবেরির গলির এক কোণে একটি মাত্র বিপ্লবী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এই হানাহানি খুনোখুনিতে কোন অংশই সে গ্রহণ করে নি। কেউ লক্ষ্য করে নি তাকে, লক্ষ্য করলে সে টিটকারি এবং পরিহাসের পাত্রই হয়ে দাঁড়াত।

এ লোকটি হল মেরায়াস। "কেন তুমি লড়ছ না ?" এ প্রশ্ন কেউ করলে হঠাৎ সে তার জবাব দিতে পারত না। সামনের এই প্রলয়ব্যাপারের দিকে সে অখণ্ড মনোযোগ রেখেছে, এমন ভাবভঙ্গী তার ভেতর থেকে প্রকাশ পায় নি। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে প্রস্তরমূর্তির মত।

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্তির দুখানা হাত নড়ে উঠল আর সেই দুহাত থেকে যুগপৎ গর্জে উঠল দুটো পিস্তল। অব্যর্থ লক্ষ্য! এক সাথে দুটো সৈনিক গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল পাঁচিলের মাথায়—সেই সৈনিক দুটো, যারা তরোয়াল দিয়ে কোর্ফেরাক আর গ্যাভ্রোচের মাথা কেটে নিতে উদ্যত হয়েছিল।

গ্যাভ্রোচ আর কোর্ফেরাক এক লাফে নেমে পড়ল চ্যানবেরির ভেতর। আর, ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটছে, বুঝতে না পেরে পাঁচিলের ওপরকার সৈনিকেরা লাফিয়ে পড়ল রাজপথের ওপরে। তখনকার মত যুদ্ধের মোড় ফিরল।

মেরায়াসের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল বিপ্লবীরা সবাই। গ্যাভ্রোচ তো প্রাণদাতার পা চেটে দিতে পারলে ধন্য হয়ে যায়, এমনিধারা ভাব তার।

মেরায়াস ভাবল—এই সুযোগে গ্যাভ্রোচের দ্বারা একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক। কাজটা তার চোখে একান্ত জরুরী। অথচ

সেটা সমাধা করে আসবার জন্য সে নিজে এখান থেকে বেরুতে পারছে না।

কাজটা আর কিছু নয়, কোজেতের কাজে বিদায় নেওয়া। সন্ধ্যায় ছাড়া তার সঙ্গে কারও দেখা হবে না, অথচ সন্ধ্যা পর্যন্ত এই রক্ষাব্যূহের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকবে না। কাজেই একমাত্র উপায় হল একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া।

গ্যাভ্রোচকে সে কথা বলতেই সে কিন্তু একটু দ্বিধার ভাব দেখালো—"আম যাব চিঠি নিয়ে, এর মধ্যে যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়? তোমরা মরে ড্যাং ড্যাং করতে করতে স্বর্গে চলে যাবে আমি হতভাগা ফিরে এসে দেখব আমিই কেবল ফাঁকি পড়ে গেছি?"

মেরায়াস হাসি চাপতে পারল না এই সঙ্গিন সময়েও—"আরে না, না, আবার যুদ্ধ বাধবার এখনও দেরি আছে। তারপর ওই হোটেলে আমরা আশ্রয় নেব যখন—সহজে আমাদের ঠাঁই-ছাড়া করতে পারবে না কেউ। তুই ফিরে এসে দেখবি স্বর্গে যাবার বহুত সুযোগ তখনও রয়েছে তোর সামনে।"

গ্যাভ্রোচ আর দ্বিরুক্তি করল না। চিঠি নিয়ে পেছন দিক দিয়ে গলি থেকে ছুটে বেরুলো তীরের বেগে।

ঠিকানাটা দূর আছে। তাহলেও গ্যাভ্রোচের চরণ দুখানি অবিলম্বে তাকে পৌঁছে দিল সেখানে।

চিঠি পৌঁছে দেওয়া ব্যাপারখানা যে খুব সহজসাধ্য নয়, এটা আগে মাথায় ঢোকে নি গ্যাভ্রোচের। বাড়ি তো পাওয়া গেল, কিন্তু মহিলাটিকে পাওয়া যাবে কেমন করে? তিনি তো রাস্তায় পায়চারি করছেন না তার প্রত্যাশায়! আর তাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে, এনে চিঠি দেওয়া? অচেনা একটা রাস্তার ছোকরা ডেকে পাঠালেই কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা বেরিয়ে আসে নাকি?

দরজায় দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছে গ্যাভ্রোচ, এমন সময়ে সে

দেখতে পেল একটা চেরি গাছের নীচে একটি বুড়ো বসে রয়েছে। বুড়োর নজরও তার দিকেই। ক্রমে বুড়ো এগিয়েও এল তার দিকে।

এগিয়ে এসে কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কাকে চাও বাবা ?"

দোমনা ভাবে গ্যাভ্রোচ বলল—"মামোয়াজেল কোজেৎকে।"

"মামোয়াজেল কোজেৎকে !"—এই উত্তরই যেন প্রত্যাশা করছিল বুড়ো—"তা কী ব্যাপার ? দেখা তো এখন হবে না তাঁর সঙ্গে। আমি এই বাড়ির দরোয়ান। কী দরকার বললে আমি গিয়ে তাঁকে বলতেও পারি, তাঁর যা বলবার আছে, তা জেনে এসে জানাতেও পারি তোমায়।"

গ্যাভ্রোচ বলল—"বলবার আমার কিছু নেই, আমি এসেছি শুধু একখানা চিঠি তার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। তা তুমি যদি চিঠিটা তাঁর হাতে দিতে পার, তুমিই দিও।"

গ্যাভ্রোচের মন পড়ে আছে চ্যানবেরির গলিতে। সেখানে এতক্ষণ হয়তো কী মজাই শুরু হয়ে গিয়েছে। কত লোক মারা পড়েছে এর মধ্যে ? আর সে বসে রইল শহরের অন্য মাথায় স্বর্গপ্রয়াণের সুযোগে ফাঁকি পড়ার জন্য ?

বুড়ো দরোয়ান হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল, আর গ্যাভ্রোচও দৌড় দিল চ্যানবেরিতে ফিরে যাওয়ার জন্য।

দরোয়ান আর কেউ নয়, স্বয়ং জঁা ভ্যালজঁা।

চিঠি সে কোজেৎকে নিয়ে দিল না। চিঠি সে খুলে ফেলল। পড়ল চিঠিখানা। মেরায়াস চিঠি লিখেছে। বুকের রক্ত দিয়ে যেন চিঠিখানা লেখা। মাতামহ উদাসীন—কোজেৎকে পাওয়ার কোন আশা নেই, এ প্রাণ রেখে লাভ কী আর, ইত্যাদি সব কথা।

জঁা ভ্যালজঁা চিঠি হাতে করে ঠায় বসে আছে। কোজেৎকে এ চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটুও উৎসাহ তার নেই। কোজেৎ

কেঁদে খুন হবে এ চিঠি পেলে, হয়তো আত্মহত্যার ইচ্ছাও তার হতে পারে, জেনে শুনে নিজের হাতে কোজেৎকে এ চিঠি সে কী করে নিয়ে দেবে ?

কোজেৎ তার চোখের মণি, তার একমাত্র স্নেহের ধন, যাকে বুকে পেয়ে বহু বৎসর আগে হারানো শিশু ভাগনে-ভাগনীগুলির শোক সে ভুলেছে। তার জীবনটা জাঁরই চোখের সামনে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে, জাঁ কি কিছুই প্রতিকার করতে পারবে না তার ? সে কি এতই অক্ষম ?

না, সে কেন অক্ষম হবে ? তার মাথার ওপর আছে বিশপ মীরিয়েলের অক্ষয় আশীর্বাদ, তার দেহে আছে অটুট শক্তি। একটা চেষ্টা সে করবেই—মেরায়াসকে উদ্ধার করে এনে কোজেতের পাশে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য। অর্থ ? মেরায়াস ভুল বুঝেছে। তার মাতামহ উদাসীন থাকলেও, মেরায়াস-কোজেতের মিলনের পথে কোন বাধা হবে না অর্থের দিক দিয়ে।

মেরায়াস লিখেছে চ্যানবেরির সংঘর্ষেই সে প্রাণত্যাগ করতে কৃতসংকল্প। জাঁও জানে চ্যানবেরিতে ভয়ানক লড়াই চলেছে রাজসৈন্যে আর বিপ্লবীদলে।

রাজসৈন্যের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষীবাহিনীকেও ডাক দিয়েছেন সরকার। অনেক ন্যাশনাল গার্ড বেরিয়েও পড়েছে কর্তব্যের আহ্বানে। সবাই যে রাজসৈন্যের সহযোগিতা করবার জন্য বেরিয়েছে, তাও নয়। যাদের অন্তরের সহানুভূতি বিদ্রোহীদের পক্ষে, তারা গার্ডের উর্দি পরেই বিদ্রোহীদের দলে ভিড়েছে।

জাঁ ভাবল সেও তাই করবে। কোজেৎকে না জানিয়েই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সেও ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য উর্দি পরেই বেরুলো।

চ্যানবেরিতে ঢুকল পেছনের দিক দিয়ে। বীভৎস দৃশ্য সেখানে।

ইতিমধ্যে একদফা লড়াই হয়ে গিয়েছে। সমস্ত গলিটা মৃতদেহে ভরতি। এঞ্জোরাস দেহগুলো দু তিন জায়গায় গাদা করে রাখবার নির্দেশ দিচ্ছে। অনেকগুলো শবই রাজসৈন্যদের। বিপ্লবীর শবও আছে। তারা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে, তাই মরছে কম। কিন্তু দু'চার জন করে মরে মরেও তারা এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর একটা আক্রমণ হলেই এ-যুদ্ধ শেষ হবে, শেষ বিপ্লবীটিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে।

মাত্র একুশজন বিপ্লবী জীবিত আছে। গ্যাভ্রোচ নেই। বীরের মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে গিয়েছে ছন্নছাড়া ভিখারী বালক। লড়াই যখন চলছিল, এক সময়ে এ-পক্ষের বুলেট প্রায় শেষ হয়ে এল। একটা হতাশার কানাঘুষা কানে গেল গ্যাভ্রোচের। সে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল, পাঁচিলের সামনের দিকে। কোণ দিয়ে এক ফুট চওড়া একটু পথ ছিল, সেই পথ দিয়ে।

সেখানে রাজপথ রাজসৈনিকদের শবে আকীর্ণ। তাদের প্রত্যেকের ঝোলায় বুলেট রয়েছে। গ্যাভ্রোচ ঝোলা ঝেড়ে ঝেড়ে বুলেট সংগ্রহ করছে, তুলছে একটা বড় ঝুড়িতে। প্রথমটা রাজসৈন্যেরা লক্ষ্যই করে নি তাকে। পরে যখন তার কাণ্ডটা লক্ষ্য করল, গুলি ছুড়তে লাগল তাকে ঘায়েল করবার জন্য।

সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যেও মরণের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে গ্যাভ্রোচ। বন্ধুরা গলির ভেতর থেকে ডাকছে—"পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়!" সে কানেও তুলছে না। ঝুড়ি হাতে করে সে আলেয়ার মত একবার এখানে, একবার ওখানে ছুটে যাচ্ছে। কোন গুলি তাকে স্পর্শ করছে না।

ঝোড়া যখন ভরতি হয়ে এল, তখন একটা গুলি লাগল তার পায়ে। পড়ে গিয়েও সে আবার উঠল। ভরতি ঝুড়ি নিয়ে সে চ্যানবেরিতে ঢুকবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পিঠে লাগল দ্বিতীয় গুলি। এবার আর সে উঠতে পারল না।

কোর্ফেরাক আর মেরায়াস ততক্ষণে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাজপথে। রাজসৈন্য তাদের তাক করবার আগেই একজন কাঁধে তুলে নিল গ্যাভ্রোচকে, আর একজন হাতে তুলে নিয়েছে বুলেটের ঝোড়াকে।

ছুটে এসে চ্যানবেরিতে ঢুকে পড়ল তারা! পেছনে এসে পড়ল একঝাঁক গুলি।

মৃত গ্যাভ্রোচের ওষ্ঠে তখনও একটুকরো হাসি লেগে আছে। স্বর্গেই গিয়েছে বালক।

বিপ্লবীরা এক মুহূর্তের জন্য এসে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। তারপর তারই আনা বুলেট দিয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করল শত্রুর ওপরে।

নয়

একুশজন মাত্র।

এইবার যে আক্রমণ হবে, সেইটিই শেষ আক্রমণ। কারণ কামান এনেছে রাজসৈন্য। ওলটানো গাড়ি আর কাঠের পিপে দিয়ে তৈরী অস্থায়ী প্রাচীর এক্ষুনি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বড়রাস্তায় এবং চ্যানবেরির গলিতে। তারপর সেই কামানের গোলা গিয়ে পড়বে ওই হোটেলটার ওপরে। সেটার পরমায়ু আর কতক্ষণ?

এই একুশজনের একজনও বাঁচবে না।

তাদের কারও এতটুকু আক্ষেপ নেই সেজন্য। মরতেই তো তারা এসেছে!

না, তাদের নেই আক্ষেপ। কিন্তু এঞ্জোরাস একটা কথা ভাবছে এই লোকগুলি মরবে যখন, কোন সংসার তো কাণ্ডারীহীন হয়ে অথই জলে ডুববে না? এমন যদি হয় যে এদের ভেতর বৃদ্ধ মাতাপিতার অন্ধের নড়ি কেউ আছে, বা অপোগণ্ড শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দেবার

ভার আছে কারও ওপরে, তাহলে তাকে মরতে দেওয়ার মানেই হল আরও কতকগুলি অসহায় প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হওয়া। এঞ্জোরাস তা হতে দিতে পারে না।

সে তার সমস্যার কথা খুলে বলল সবাইকে। এমন কেউ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করল জনে জনে।

তখন প্রকাশ পেলো—অন্ততঃ পাঁচজন রয়েছে এমন লোক।

"এদের পাঁচজনকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে"—আদেশ দিল এঞ্জোরাস।

কিন্তু বলা সহজ, করা তত সহজ নয়। ফিরে যাবে তারা কোন্ পথে? সামনে কামান, পেছনেও চ্যানবেরির মোড়ে ইতিমধ্যে পুলিস ঘাঁটি করে বসেছে। মাছিটিরও বেরুবার উপায় নেই এই মরণফাঁদ থেকে।

একুশজনের ভেতর চারজন ছিল ন্যাশনাল গার্ড। গার্ডের উর্দি তাদের গায়ে। তারা সেই উর্দি খুলে দিল—"এই উর্দি পরে চারজন বেরিয়ে যেতে পারবে। ন্যাশনাল গার্ডকে সৈন্য বা পুলিস কেউ কিছু বলবে না।"

তাদের ধন্যবাদ দিল এঞ্জোরাস। চারজনের বেরুবার উপায় হল, কিন্তু লোক যে পাঁচটি?

তখন সেই পাঁচজনের ভেতর বেধে গেল উদারতার প্রতিযোগিতা এ বলে আমি থাকব, ও বলে আমি থাকব। মীমাংসা আর হয় না। অথচ মূল্যবান সময় চলে যায়। কখন রাজসৈন্য কামান দাগতে শুরু করবে, কেউ বলতে পারে না।

তবু সেই বিতণ্ডা, প্রত্যেকেই বলে—"থাকব আমিই।"

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল—"কাউকেই থাকতে হবে না, তোমরা পাঁচজনই বেরুতে পারবে।"

চমকে উঠে সবাই দেখল—এক বৃদ্ধ কখন এসে দাঁড়িয়েছে মড়ার

গাদার পেছনে, কথা কইছে সেই। তার পরিধানে আছে ন্যাশনাল গার্ডের উর্দি, তাই সে খুলতে ব্যস্ত।

"কে আপনি?" জিজ্ঞাসা করে এঞ্জোরাস।

"তোমরাও যা, আমিও তাই। ফরাসীদেশের নাগরিক। একটু তফাত আছে শুধু। তোমরা যুবক, আমি বৃদ্ধ। অর্থাৎ আমার জীবনের দাম অনেক কম।"—নিজের উর্দি সে এঞ্জোরাসের হাতে তুলে দিল।

এঞ্জোরাস বিচলিত স্বরে বলল—"এর অর্থ বুঝতে পারছেন তো? আপনি নিশ্চয়ই মরবেন।"

বৃদ্ধ হাসল একটুখানি, উত্তর দিল না কিছু।

সেই পাঁচজনকে গার্ডের পোশাক পরিয়ে বিদায় দিল এঞ্জোরাস। তারা যায়, আর ফিরে ফিরে চায়। যেন কত প্রিয়জনদের পেছনে ফেলে চিরদুঃখের কবলে তারা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে।

তারা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই এঞ্জোরাস আদেশ দিল—"বাকী সতেরোজন হোটেলে আশ্রয় নাও।"

সত্যিই দেরি করার সময় ছিল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামান গর্জে উঠল প্রাচীরের ওধার থেকে।

জঁা ভ্যালজঁাও চলল। সে সর্বদাই সতর্ক আছে, যাতে মেরায়াস তার মুখ দেখতে না পায়।

হোটেলে প্রবেশ করেই এঞ্জোরাস চমকে উঠল—"আরে যাঃ, একে নিয়ে এখন করি কী?"

কথাটা সে বলেছে জ্যাভারকে লক্ষ্য করে। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল বিপ্লবীরা। জ্যাভার সেই থেকে টেবিলের ওপর পড়ে আছে—হাত-পা বদ্ধ অবস্থায়।

বিপ্লবীরা একবাক্যে বলে উঠল—"ওকে গুলি করে মারো।"

সবাইয়ের মতের বিরুদ্ধে কথা কওয়া নেতার সাজে না।

এঞ্জোরাসও সায় দিতে বাধ্য হল। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল—"জল্লাদের কাজ তাহলে কে করবে?"

এইখানে বাধল সমস্যা। মুখোমুখি লড়াইয়ে শত্রুনিধন করতে কোন যোদ্ধারই আপত্তি হয় না, কিন্তু নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করা? সে আলাদা কথা, ঘৃণ্য কাজ।

হঠাৎ পেছন থেকে একজন বলল—"ও কাজ আমার ওপর ছেড়ে দাও তোমরা।"

জ্যাভার চমকে ঘাড় ফেরাল সেই কণ্ঠস্বর শুনে। চিনল সে। মৃদুহাস্যের সঙ্গে সে শুধু বলল—"স্বাভাবিক।"

স্বেচ্ছায় জল্লাদগিরি করবার ভার যে নেয়, তার ওপর ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জঁা ভ্যালজঁাকে নিজের উর্দি খুলে দিতে যারা দেখেছে, তারা তাকে ঘৃণা করে কেমন করে? তারা শুধু মনে মনে বলল—"লোকটি একটি প্রহেলিকা।"

বাঁধন খুলে দিয়ে টেবিল থেকে জ্যাভারকে তুলল জঁা ভ্যালজঁা। তখন জ্যাভারের হাত বাঁধা এবং কোমরে দড়ি ঝুলছে। সেই দড়ি ধরে জ্যাভারকে সে দোতলা থেকে নীচে নামাতে লাগল।

"গলিতে নিয়ে কাজ শেষ করি, এখানে একটা মড়া পুষে রেখে লাভ কী?" এটা জঁার কৈফিয়ত। খুব জোরালো কৈফিয়ত নয়, কারণ, এক্ষুনি তো সতেরোটা মড়া গড়াগড়ি যাবে এই দোতলায়।

পিস্তল উঁচিয়ে ধরে জ্যাভারের পেছনে পেছনে নামছে জঁা ভ্যালজঁা। জ্যাভার ঘাড় ফিরিয়ে শুধু বলল—"হাতে পেলে আমিও তোমাকে ছাড়তাম না, তুমি বা আমাকে ছাড়বে কেন?"

জঁা উত্তর দিল না। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। জ্যাভারকে নিয়ে দাঁড় করাল একটা বৃহৎ মড়ার গাদার পশ্চাতে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে পিস্তল কোমরে গুঁজে বুকের ভেতর থেকে ছোরা বার করল।

জ্যাভার আবার হাসল—"ঠিক? পিস্তল বীরের অস্ত্র। দাগী গুণ্ডার হাতে ছোরাই মানায়।"

এবারও কথার উত্তর দিল না জঁা। ছোরা দিয়ে প্রথমে জ্যাভারের কোমরের দড়ি কেটে দিল। তারপর কেটে দিল হাতের বাঁধন—"পালাও।" শুধু বলল—"পালাও!"

বলেই কোমর থেকে পিস্তল নিয়ে আকাশে তাক করে সে গুলি ছুড়ল। দোতলায় বিপ্লবীরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল—মরেছে গোয়েন্দাটা।

পিস্তলের আওয়াজ করেই জঁা ভ্যালজঁা জ্যাভারের দিকে পেছন ফিরে দোতলায় উঠতে লাগল। আর জ্যাভার?

জ্যাভার আড়ষ্ট, জ্যাভারের জ্ঞানবুদ্ধি অনুভূতি সব বুঝি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই একই জায়গায় অনেকক্ষণ। দোতলার সিঁড়ির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। মানুষ সম্বন্ধে তার ধ্যানধারণা সব উলটে-পালটে যাচ্ছে। জঁা ভ্যালজঁা প্রাণভিক্ষা দিয়ে গেল তার পরম শত্রুকে? জঁা ভ্যালজঁাকে হাতে পেলে যে শত্রু এক্ষুনি ফাঁসিতে লটকায়?

হঠাৎ গুম গুম শব্দে চমকে উঠল জ্যাভার। একটা কামানের গোলা এসে পড়েছে গলির ভেতরে। লোহার টুকরো সব ছিটকে এসে জ্যাভারের আশেপাশে পড়ছে।

ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে জ্যাভার সে-স্থান ত্যাগ করল।

* * *

কামানের গোলার মুখে পাঁচিল নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে গিয়েছে। হোটেল ভেঙে পড়েছে। রাজসৈন্য ধেয়ে এসেছে চ্যানবেরির ভেতরে। যারা কামানের গোলায় মরে নি এতক্ষণ, তারা এইবার তরোয়ালের আঘাতে মরতে লাগল। সতেরোটা বীর বিপ্লবীর ধরাশয্যা গ্রহণ করতে বেশী সময় লাগল না।

না ঠিক সতেরোটা নয়। একজন আহত হয় নি, কারণ সে যুদ্ধই করে নি। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মড়ার গাদার আড়ালে।

দাঁড়িয়েছিল, কারণ মানুষ মারতে সে চ্যানবেরিতে আসে নি, এসেছে মেরায়াসকে বাঁচাবার জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা করবে বলে।

মেরায়াসের সঙ্গে সে একটি কথাও বলে নি, তার সামনে যায়নি পর্যন্ত। দূর থেকে শুধু নজর রেখেছে তার গতিবিধির ওপর। হোটেল ভেঙে পড়তে যে কয়েকজন নেমে আসতে পেরেছিল দোতলা থেকে, মেরায়াস তাদের মধ্যে একজন। গলিতে নেমে আসতেই সে একটা তরোয়ালের চোট খেলো, পড়ে গেল মাটিতে টিয়েলু।

রাজসৈন্য ছুটে গেল ভাঙ্গা হোটেলের দিকে। এখনও বিপ্লবীরা কেউ সেখানে লুকিয়ে আছে কিনা, দেখবার জন্য। জঁা ভ্যালজঁা অমনি এসে মেরায়াসকে কাঁধে তুলল। গিয়ে দাঁড়াল মড়ার গাদার পেছনে, যেখানে সৈন্যরা দেখতে পাবে না তাকে।

বুকে হাত দিয়ে দেখল—মেরায়াসের হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে তখনও। নাকে হাত দিয়ে দেখল—তখনও নিশ্বাস পড়ছে। মাথাটা ভয়ানক রকম জখম হয়েছে, একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বেচারা। এক্ষুনি যদি নিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া যায়—

কিন্তু নিয়ে যাওয়ার উপায়টা কী? সামনে কাতারে কাতারে রাজসৈন্য, পেছনে পুলিসঘাঁটি। জঁার পরিধানে ন্যাশনাল গার্ডের উর্দি থাকলেও বা কথা ছিল তাও নেই। এ মরণফাঁদ থেকে জঁা বেরুবে কী করে?

কিন্তু না বেরুলে তো মেরায়াসকে সে বাঁচাতে পারবে না। কোজেতের জীবনটা যে শ্মশান হয়ে যাবে! ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না?

ভগবানের নাম মনে পড়তেই অভ্যাসবশে আকাশপানে চোখ তুলল জঁা। পাখি উড়ে যাচ্ছে আকাশে। মনে হল—"হায়! আমার যদি অমনি পাখা থাকত! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পশ্চাতে কোনদিকে যখন যাওয়ার উপায় নেই, ওপর দিয়েই পালাতাম মেরায়াসকে নিয়ে।"

ওপরের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে দৃষ্টি পড়ল। প্যারী শহরের নীচে আছে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। শহরের সব জল নেমে যায় সেই সব সুড়ঙ্গে, বেয়ে চলে যায় সীন নদীতে। হেন রাস্তা নেই প্যারীতে, যার নীচে সুড়ঙ্গ নেই। রাস্তা থেকে যাতে জল নামতে পারে সুড়ঙ্গে, তার জন্য মাঝে মাঝেই রাস্তার ওপরে লোহার ঝাঁজরি আছে। দরকারমত সে-ঝাঁজরি তোলাও যায়।

ভগবান প্রসন্ন। জাঁ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তারই নিকটে একটা ঝাঁজরি। চারপাশ সিমেন্ট দিয়ে আটকানো ছিল, কামানের গোলার আঘাতে সিমেন্ট ভেঙেচুরে ঝাঁজরির ঢাকনা আলগা হয়ে পড়েছে। জাঁ ভ্যালজাঁর গায়ে এখনও আসুরিক শক্তি, জোর দিয়ে টানতেই ঢাকনা উঠে গেল।

ঝাঁজরির নীচে একটা কূপ। মেরায়াসকে বুকে জাপটে ধরে জাঁ সাবধানে নেমে গেল সেই কূপের ভেতর। নীচে নেমে টেনে টেনে ঢাকনা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল, যাতে ওপর থেকে রাজসৈন্যেরা দেখলে কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

তারপর শুরু হল পথের সন্ধান। ঝাঁজরি দিয়ে নেমেছে, উঠতেও হবে ঝাঁজরি দিয়েই। কিন্তু কতদূরে গিয়ে উঠলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানো যাবে?

সেইখানেই সমস্যা। চ্যানবেরি এলাকার বাইরে অবশ্য সৈন্য বা পুলিসের ঘাঁটি নেই। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় নিয়মিত পুলিস পাহারা তো আছেই! দিনের বেলার কথা ছেড়েই দাও, গভীর রাত্রিতেও বন্দুকধারী সান্ত্রী ঘুরছে পথে পথে। ঝাঁজরির মুখ দিয়ে জাঁ যখন বেরুবে কাঁধে একটা মুমূর্ষু আহত লোককে নিয়ে, তখন সান্ত্রীর চোখে পড়ে যাওয়ার ষোল আনাই সম্ভাবনা আছে বইকি! আর তা যদি সে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাজতবাস, তারপরেই জ্যাভারের

শুভাগমন, এবং আবার এই একান্ত বৃদ্ধবয়সে ত্যুলোঁ। বন্দরের জাহাজে জাহাজী গোলামবৃত্তি।

না, সে-ঝুঁকি নেওয়া চলে না। নিজের কথা ছেড়ে দিলেও, মেরায়াসের কথা চিন্তা করেই চলে না। জাঁ ধরা পড়ে গেলে মেরায়াসের চিকিৎসা বা শুশ্রূষা কে করবে? পুলিস? হাঃ হাঃ হাঃ—তাহলে আর ভাবনা ছিল কী?

না, শহরের কোন অংশেই ঝাঁজরির মুখ দিয়ে জাঁর বেরুনো চলবে না। অন্য পথ আবিষ্কার করতে হবে।

অন্য পথ? হ্যাঁ, একটা আছে। সীন নদী।

এই সব সুড়ঙ্গের জল গিয়ে সীন নদীতে পড়ে। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ-রাজ্যের একটা মুখ সীন নদীর ওপরে। সেইখানে যদি পৌঁছোনো যায়, সীনের জলে যদি অঙ্গ ভাসানো যায় একবার, মেরায়াসকে পিঠে নিয়েও জাঁ এপারে বা ওপারে যে-কোন একটা নিরাপদ জায়গায় কূলে উঠতে পারবে।

অতএব—সীন নদীর দিকেই যেতে হবে।

কোন্ দিকে সীন? কেন? যেদিকে সুড়ঙ্গ ঢালু হয়ে নামছে, সেই দিকেই নিশ্চয়! অন্ধকারে চোখে পড়ে না কিছু, কিন্তু পায়ে মালুম পাওয়া যায়—ঢাল কোন্ দিকে। সেই বিষয়টাতে খেয়াল রেখে সতর্ক পদক্ষেপে সুড়ঙ্গ-পথ অতিক্রম করতে লাগল জাঁ।

অন্তহীন সে পথ। কোথাও সরু, কোথাও চওড়া কোথাও মাথায় ছাদ ঠেকে যাচ্ছে, কোথাও বা মাথার ওপরেও দু এক ফুট উঁচু। দুধারে পাকা দেওয়াল ভিজে স্যাঁৎসেঁতে, পায়ের তলায় তো সর্বদাই জল ভাঙ্গতে হচ্ছে। সে জল কোথাও পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোথাও আবার হাঁটুর অর্ধেকটা উঠছে। ভিজে বাতাস দুর্গন্ধে ভরা, গন্ধটা পচা পাঁকের এবং বিষাক্ত বাষ্পের।

পাঁক? হ্যাঁ, সুড়ঙ্গের মেঝে প্রায় জায়গাতেই বেমেরামত, অনেক জায়গায় ভেঙে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে গভীর পাঁক,

আঠার মত চটচটে পাঁক—যার ভেতর একবার পড়লে পা টেনে তোলা রীতিমত কষ্ট হয়।

ঘুরে ঘুরে সুড়ঙ্গ চলেছে, ডাইনে বাঁয়ে একের পর আর এক শাখাসুড়ঙ্গ। অনেক সময় শাখাগুলিই এই প্রধানের চাইতে বেশী চওড়া। সেক্ষেত্রে জঁা পুরানো পথ ছেড়ে শাখাপথই অবলম্বন করছে। কারণ তার ধারণা, নদীর নিকটতম সুড়ঙ্গগুলিই সবচেয়ে চওড়া হবে।

মেরায়াস? বেঁচে আছে তো? দু চার মিনিট পরেই জঁা ভ্যালজঁা মেরায়াসের বুকে হাত দিয়ে দেখছে, নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখছে। সন্দেহ হবারই কথা। সেই যে চ্যানবেরির গলিতে সে অচেতন দেহখানি কাঁধে তুলে নিয়েছে, তারপরে আর এক মুহূর্তের জন্যেও চৈতন্য ফিরে আসে নি মেরায়াসের। মড়ার মতই সে পড়ে আছে জঁার কাঁধের ওপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, আর কতক্ষণ এই অচেতন দেহের ভেতর প্রাণটার অস্তিত্ব থাকবে?

হায়, চোখে মুখে এক ঝাপটা জলও যদি দিতে পারা যেত! কোনও উপায় নেই তার। এমন এক রাজ্যে জঁা এসে পড়েছে, যেখানে জল একান্ত অমিল। অর্থাৎ, মানুষের ব্যবহার্য জল। পচা জল আছে, দুর্গন্ধ জল আছে, আছে বিষাক্ত জীবাণুপূর্ণ জল, স্পর্শ যা করতে ঘৃণা করে, স্পর্শ করা সুস্থ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্যারীর নীচে এই সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা, এ যেন নিজেই একটা আলাদা রাজ্য। প্যারীর সমানই বহুবিস্তীর্ণ এই রাজ্যে মানুষও যে একেবারে নেই, তা নয়। আইনের হাত থেকে পলাতক চোর ডাকাত গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের এ একটা নিরাপদ আশ্রয়। এ অঞ্চলে নিয়মিতভাবে রোঁদ দেওয়ার জন্য বিশেষ পুলিস ফৌজের বন্দোবস্তও করেছেন সরকার। অবশ্য তাদের দ্বারা কাজ যে সামান্যই হয়, তা তো বলাই বাহুল্য।

এই পুলিস টহলদারদের পাল্লাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল জঁা। দূর থেকে একটা আলো দেখতে পেল হঠাৎ। গাঢ় অন্ধকারে সেই আলোর বিন্দুটিকে দেখে কেঁপে উঠল জঁা ভ্যালজঁা—যেন গহন অরণ্যে দেখতে পেয়েছে হিংস্র শার্দূলের জ্বলন্ত চক্ষু।

আলোটা এগুচ্ছে, জঁা পিছুতে লাগল। আলোটা ডাইনে ঘুরছে, জঁা ঘুরে পালাল বাঁয়ের সুড়ঙ্গে। পুলিস দলের কি সন্দেহ হয়েছে নাকি? তারা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে কেন? হঠাৎ সাঁ করে গুলি ছুটে গেল জঁা-র কানের কাছ দিয়ে। সে সুড়ঙ্গের দেয়াল চেপে দাঁড়াল।

পুলিস চলে গেল অন্যদিকে! জঁা ভ্যালজঁা কপালের ঘাম মুছে ফেলে আবার ধরল সীন নদীর পথ। মুমূর্ষু মেরায়াসকে কাঁধে নিয়ে সে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে চলেছে—এই অবস্থায় পুলিসের হাতে ধরা পড়লেই হয়েছিল আর কি!

ঢালু পথ নদীর দিকে চলেছে। মাঝে মাঝেই জল। পায়ের পাতা ছাড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে। কী ঘন আঠালো পঙ্কিল জল! কী পচা গন্ধ? হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর, কোমর ছাড়িয়ে বুক পর্যন্তও। এ কী হল! মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল জঁা। পায়ের নীচে পাকা গাঁথনি তো নেই-ই, মাটি পর্যন্ত নেই। কী আছে তাহলে? আছে কাদা। অথবা, কাদাও বলা যায় না সে-বস্তুকে। কাদা মেশানো জল বললেই ঠিক হয় তাকে। তার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায় না, তার ভেতর দিয়ে সাঁতারও দেওয়া যায় না। এদিকে সাপের মত কিলবিল করতে করতে সেই নোংরা জিনিসটা পোশাকের ভিতর ঢুকে পড়ছে। ঠাণ্ডায় গা অবশ হয়ে আসতে চায়, দুর্গন্ধে দম আটকে আসে বুঝি।

পচা জল বুকের ওপর উঠেছে। জঁা নিজের দেহের ভারেই তলিয়ে যাচ্ছে সেই থকথকে কাদায়। চোরাবালির নাম শোনা

ছিল, এ যেন চোরা কাদার দহ। ডুবতে ডুবতেও সে কোনরকমে নিজেকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ভাসিয়ে রেখেছে নিজেকে শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে।

এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু কোথায় চলেছে, তা জানে না। ঘুরঘুট্টি আঁধারে নাকের সামনে ছয় ইঞ্চিও নজর চলে না। ক্রমেই যদি এই কাদার দহ গভীর থেকে গভীরতম হয়ে ওঠে! হয়েই তো উঠছে। গলা পর্যন্ত উঠল, ঠোঁট পর্যন্ত। শক্ত করে মুখ বন্ধ করে রেখেছে জাঁ, যাতে এই পচা, বিষাক্ত কাদার এক ফোঁটাও মুখের ভেতর ঢুকতে না পারে। কিন্তু তা না হয় না ঢুকল, নাকের ভেতর দিয়ে ঢোকা বন্ধ করা যাবে কি করে? নাক পর্যন্ত তো এক্ষুণি উঠে আসবে কাদা! আর একবার পা ফেললেই হয়তো।

মেরায়াসের গায়ে কিন্তু এক ফোঁটা কাদা লাগতে দেয় নি জাঁ। দুই হাতে উঁচু করে তার দেহটা মাথার ওপরে শূন্যে ধরে রেখেছে। লোহার ডাণ্ডার মত হাত দুখানাও ভার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। বেশীক্ষণ এভাবে তাকে ধরে রাখাও যাবে না।

মাথার ওপর মেরায়াস, পায়ের তলায় অবলম্বনের অভাব, এই অবস্থাতেই ভগবান স্মরণ করে শেষ বার নিজের দেহকে সামনে ঠেলে দিল জাঁ। শেষ বার! কারণ, এর পরই কাদাজল গলগল করে নাসিকায় ঢুকে পড়বে—নিশ্বাস নেবার আর উপায় থাকবে না—

ভগবান দয়া করেছেন।

পায়ের তলায় শক্ত একটা কিছু ঠেকেছে। তারই ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ল জাঁ, ধন্যবাদ দিল ভগবানকে। তারপর অতি সতর্কভাবে সামনের দিকে পা বাড়াল আবার, কী জানি আবার যদি কাদাতেই পা পড়ে যায়।

না, তা পড়ল না। পায়ের নীচে সেই শক্ত জিনিসটাই রয়েছে এখনও। সাহস করে সে হাঁটবার চেষ্টা করল।

সেই শক্ত গাঁথনিটাই বরাবর ঢালুভাবে ওপরে উঠে গিয়েছে। এটা সুড়ঙ্গের মেঝেরই অংশ একটা। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দু টুকরো হয়ে গিয়েছিল কে জানে কত বৎসর আগে। তারপর ফাটলের মুখ বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে ক্রমশঃ, কাদার দহ সৃষ্টি হয়েছে, যা পথচরের পক্ষে মারাত্মক। জঁার মনে পড়ল—ত্যুলোঁর কারাগারে দাগী চোরদের মুখে সে এরকম কাদার দহের গল্প শুনেছে। প্যারীর ভূগর্ভে এইরকম দহে পড়ে কত পলাতক অপরাধী যে উঠতেই পারে নি আর, এ গল্প শুনে গা সিরসির করে উঠেছে সেই যুগেই!

ভগবানের করুণায় একটা সাংঘাতিক সংকট সে পার হয়ে এল নিরাপদে। এইবার তাড়াতাড়ি সীন নদীতে পৌঁছোতে পারলে হয়।

না পারলে মেরায়াসকে আর বাঁচানো যাবে না নিশ্চয়ই। এখনও পর্যন্ত জীবনটা তার কণ্ঠার কাছে এসে ঠেকে আছে বটে, কিন্তু আর বেশীক্ষণ তাকে ধরে রাখা যাবে বলে আশা করা যায় না কোনমতেই।

অবশেষে বহুদূরে যেন দিনের আলো দেখা গেল।

অবসন্ন দেহকে টেনে নিয়ে, দ্রুত পা চালিয়ে দিল জঁা, সেই আলোকরেখা লক্ষ্য করে।

আলোটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, উজ্জ্বল থেকে আরও উজ্জ্বল।

অবশেষে সত্যিই সীন নদী চোখে পড়ল। সূর্যালোকে নৃত্য করছে চঞ্চলা উর্মিমালা। কোথাও একখানা নৌকা চোখে পড়ে না, প্যারীর শহরতলির এ অংশটা খুবই নির্জন।

তাড়াতাড়ি জঁা এসে পড়ল সুড়ঙ্গের মুখে। মুক্তি বুঝি নিকট।

কিন্তু, বড় আশায় ছাই পড়ল। সুড়ঙ্গমুখে লোহার দরজা, তার বাইরে থেকে বড় একটা তালা ঝুলছে।

যাতে অবাঞ্ছিত অতিথিরা, চোর ডাকাত গুণ্ডারা, অবাধে সুড়ঙ্গে

ঢুকতে না পারে, তারই জন্য পুলিসের তরফ থেকে এই তালা লাগানোর বন্দোবস্ত। চোর-ডাকাতদের অবশ্য এর দ্বারা আটক করা যায় না, তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে আটকানো গিয়েছে জ্যঁকে। এবং তারই ফলে মুমূর্ষু মেরায়াসের জীবনরক্ষার আশা হয়েছে বিলুপ্ত।

এই বৃদ্ধবয়সেও অসুরের শক্তি জ্যঁর দেহে! সেই শক্তি প্রাণ-পণে বারবার প্রয়োগ করেও জ্যঁ দরজার লোহার গরাদে ভাঙ্গতে পারল না। গরাদেগুলো অস্বাভাবিক মোটা। তালাটাকে হাতের নাগালে পেলে সেটা অবশ্য ভাঙ্গতে পারত, কিন্তু সেটা ঝুলছে বাইরে থেকে, ভেতর থেকে তাকে কায়দা করা যায় না।

বার বার ব্যর্থ চেষ্টার পর হতাশ হয়ে জ্যঁ বসে পড়েছে, এমন সময়ে বাইরে থেকে কে বলে উঠল—"আধা-আধি বখরা।"

জ্যঁ চমকে লাফিয়ে উঠল। সুড়ঙ্গমুখের ঠিক বাইরে, লোহার দরজার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

অনেক দিন পরে দেখা, তবু জ্যঁ তাকে চিনল—সে সেই থিনার্ডিয়ার।

* * *

থিনার্ডিয়ার নামতে নামতে অনেক নেমেছে। হোটেল ফেল হয়েছিল, কোজেৎ চলে আসবার পরেই। তারপর একে একে নানা ব্যবসায় সে লিপ্ত হয়েছে, বলা বাহুল্য সবগুলিই পুলিসের চোখে আপত্তিজনক। ফলে পুলিসের তাড়া ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দাঁড়িয়েছে থিনার্ডিয়ারের পেছনে। সে পালাতে বাধ্য হয়েছে শহর থেকে, দিবালোক থেকে অন্তর্ধান করে প্যারীর ভূগর্ভে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে বসতি স্থাপন করেছে পাকাপোক্ত ভাবে। তার স্ত্রীর হয়েছে মৃত্যু, দুই কন্যা ছিটকে পড়েছে সমাজের বাইরে—যেভাবে পারে নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করবার জন্য পুত্র গ্যাভ্রোচ, ঘটনাচক্রের কোন্ শুভ আবর্তনে বীর মৃত্যুলাভ করে ধন্য হয়েছে—এই সবেমাত্র গতকাল।

থিনার্ডিয়ার কারও কোন খবর রাখে না। রাতটা শহরের অলিগলিতে ঘোরে চুরি রাহাজানির চেষ্টায়। যা উপার্জন করে, তাই দিয়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে সকালে এসে ঢোকে সুড়ঙ্গের ভেতর। আজও তাই এসেছে। সুড়ঙ্গের তালার জন্য নকল চাবি সে তৈরী করে নিয়েছে। সুড়ঙ্গবাসী সব পলাতকই এমন চাবি রাখে।

আজ তালা খুলতে এসেই সে দেখে—একটা মরা বা আধমরা মানুষকে নিয়ে এসে একটা পালোয়ান-গোছের লোক তালা বা দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। সে তৎক্ষণাৎ ধারণা করে নিল পালোয়ানটা তারই জাতভাই অর্থাৎ খুনে দস্যু। তাই সে হেঁকে উঠল—"আধা-আধি বখরা।" অর্থাৎ ওই আধমরা লোকটার কাছ থেকে যা পেয়েছ, তার অর্ধেক আমায় দাও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

জাঁ কিন্তু দেখামাত্রই থিনার্ডিয়ারকে চিনেছে। এখন থিনার্ডিয়ারও যাতে তাকে না চিনতে পারে, সেই জন্য সে আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল—"রাজী, খোলো দরজা।"

থিনার্ডিয়ার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল এবং এমনভাবে দাঁড়াল —যাতে আগে বখরা না দিয়ে জাঁ বেরুতে না পারে।

সে আগে জাঁর সমস্ত পোশাক পরীক্ষা করে দেখল। অন্য দিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দানখয়রাতের জন্য জাঁ প্রচুর অর্থ নিয়ে বেরিয়ে থাকে। আজ সে এসেছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মেরায়াসকে উদ্ধার করবার জন্য, অর্থ নিয়ে আসার কথা মনেই হয় নি।

তার কাছে একটা সাউও না পেয়ে থিনার্ডিয়ার মেরায়াসের দেহ তল্লাশী আরম্ভ করল। মেরায়াসের টাকার থলি পেতেও দেরি হল না—তাতে পেল পনেরো সাউ।

হতাশ হয়ে থিনার্ডিয়ার শিস দিতে লাগল—"মশা মেরে হাত

কালি করেছ স্যাঙ্গাৎ।” এই বলে সে আবার মেরায়াসের দেহ হাতড়াতে লাগল। এবার অবশ্য অর্থের জন্য নয়। অর্থ যে ওর কাছে আর নেই, তা সে নিশ্চিত বুঝেছে।

এবারে সে হাতড়াবার অছিলায় মেরায়াসের কোটের ভেতর দিককার কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে নিল এবং জাঁর অলক্ষিতে সেটা লুকিয়ে ফেলল নিজের জামার ভেতর। ভবিষ্যতে এই ছেঁড়া টুকরোটার সাহায্যে সে হয়তো এই অচেতন লোকটার এবং তার আততায়ীর পরিচয় জানতে পারবে।

তারপর জাঁকে বেরুতে দিল মেরায়াসকে নিয়ে।

জাঁ চলল সীন নদীর বাঁধের দিকে। বাঁধের দিকে অদূরে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় আশায় বুক বেঁধে সে সেই দিকে এগুলো—এই গাড়িতে যদি মেরায়াসকে নিয়ে যাওয়া যায় গিলেনর-ম্যানের বাড়িতে।

গাড়ির কাছে যে লোকটাকে সে দেখতে গেল—হায় ভগবান! সে জ্যাভার।

জ্যাভার আর জাঁ ভ্যালজাঁ—দু জন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে।

তারপর কথা কইল জাঁই। সে বলল—“আমি কথা দিচ্ছি—পালাব না। ওই গাড়িতে করে এই ছেলেটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দাও, দেরি হলে সে বাঁচবে না। তারপর আমায় নিয়ে হাজতে পুরে দিও। আমি কোন চেষ্টা করব না পালাবার।”

জ্যাভার নীরব। নীরবেই জাঁকে সাহায্য করল—মেরায়াসকে গাড়ির ভেতর শুইয়ে দিয়ে তারপর জাঁ ও সে ভেতরে বসল। গাড়ি চলতে লাগল শহরের দিকে।

দশ

গিলেনরম্যানের বাড়িতে সেদিন হইচই পড়ে গেল।

শত সাধ্যসাধনায় যাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা যায় নি, সেই অভি-মানী মেরায়াস আজ এসেছে। তাকে নিয়ে এসেছে পুলিসের গাড়ি। আহত, অচেতন, জীবন্মৃত। প্রকৃতপক্ষে, তাকে দেখে বোঝা শক্ত যে সে বেঁচে আছে না মরে গেছে।

ভৃত্যেরা ছুটোছুটি শুরু করল, বৃদ্ধ মাতামহ বুক চাপড়াতে লাগলেন। ধরাধরি করে মেরায়াসকে ওপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

এই পর্যন্ত দেখে জঁা ভ্যালজঁা বলল—"চল জ্যাভার, যাওয়া যাক। তবে, অনেক দয়া তুমি করেছ, একবার আমার বাড়িটা যদি ঘুরে আসতে দাও, তাহলে আর আমার কোন আপসোস থাকে না, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে ঢুকতে পারি।"

বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু কোজেৎকে মেরায়াসের নতুন ঠিকানা দেওয়া, এবং ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের দরুন কোজেতের নামেই একটা দানপত্র লিখে ফেলা। দশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।

জ্যাভার আগের বারও কোন কথা বলে নি, বলল না এবারও। গাড়ি ছুটল ভ্যালজঁার বাড়ি।

"আমি দশ মিনিটের বেশী সময় নেব না"—বলে দ্রুত বাড়িতে ঢুকে জঁা নিজের ঘরে প্রবেশ করল। জানালা বন্ধ ছিল, খুলে দিল তাড়াতাড়ি। আর খুলে দিতেই রাস্তাটা চোখে পড়ল তার।

গাড়ি? জ্যাভারের গাড়ি কোথায় গেল? এদিকে ওদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কোন গাড়ি কোথাও নেই।

এ কী হল? বুঝতে পারে না জঁা ভ্যালজঁা।

হল যা, তা এই। জাঁ বাড়ির ভেতর ঢুকতেই, জ্যাভার চালককে ইঙ্গিত করল গাড়ি চালিয়ে দিতে।

সীন নদীর দিকেই ফিরল সে। তারপর নদীর কাছাকাছি এসে গাড়ি সে বিদায় করে দিল। থানায় ফিরে যাক কোচোয়ান।

তারপর সে হাঁটতে শুরু করল নদীর দিকে। আনমনা, উদ্দেশ্যহীন। কী জন্য সে সীনের দিকে চলেছে, তা বলতে পারে না সে। মনের রাজ্যে একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে জ্যাভারের। এতকাল যে সব মূলনীতি অবলম্বন করে সে জীবনটাকে সোজা পথে চালিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল, সে নীতিগুলোরই গোড়ার মাটি সরে গিয়েছে, তারা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে চাইছে।

তস্করকে, দস্যুকে, আইনলঙ্ঘনকারীকে ধরতে হবে, সাজা দিতে হবে—এই হল সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। এর মধ্যে কোন আপস রফার স্থান নেই, এই ছিল জ্যাভারের বিশ্বাস। ভগবান আছেন কি নেই, এ নিয়ে জ্যাভার কোনদিন মাথা ঘামায় নি। আইন আছে, এইটি জেনেই সে খুশী ছিল। আইন অভ্রান্ত, আইন ধ্রুব, মানুষের সমাজকে যদি খাড়া থাকতে হয়, তবে একটিমাত্র জিনিসের প্রতি তার আনুগত্য থাকা প্রয়োজন, সে হল আইন।

এই জাঁ ভ্যালজাঁ আইন ভেঙ্গেছিল। রুটি চুরি করেছিল একটা। উচিত সাজা সে পেয়েছিল। তারপর সে বার বার আইন ভাঙ্গল, জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। আবারও তার উচিত সাজা হল। সাজা ভোগ করে সে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে, ক্ষুদে জার্ভেই-এর ডবল সাউ কেড়ে নিয়ে আবার আইন ভাঙ্গল। তার সাজা এখনও সে নেয় নি, সেই সাজা দেবার জন্য জ্যাভার এখনও তার পেছনে লেগে আছে। লেগে থাকতে সে বাধ্য, না থাকলে আইনের মর্যাদা থাকে না, সমাজের ভিতই ধ্বসে পড়ে।

এ পর্যন্ত হিসাব ঠিক আছে, জ্যাভারের কর্তব্য পরিষ্কারভাবে

চিহ্নিত রয়েছে, সেই কর্তব্যের পথে চলবার চেষ্টা করেছে বলে জ্যাভার ছিল খুশী, তার বিবেক ছিল পরিতৃপ্ত।

কিন্তু সেই বিবেকই এখন সংশয়ে সমাচ্ছন্ন। আইন অভ্রান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য সব-কিছুই কি অর্থহীন! ক্ষুদে জার্ভেইয়ের ডবল সাউ কেড়ে নেওয়াটাই সমাজের চোখে একমাত্র সত্য বস্তু, আর ফকলেভেণ্টের জীবন রক্ষা করার কোনই মূল্য নেই? শুধু ফকলেভেণ্ট নয়, চ্যানবেরির হোটেলে জ্যাভারের নিজেরই জীবন রক্ষা করেছে ওই জাঁ ভ্যালজাঁ। তারপর—ওই মরণাপন্ন যুবক মেরায়াস—তাকে কাঁধে করে প্যারী শহরের গোটা সুড়ঙ্গ-রাজ্যটা পরিভ্রমণ করবার কী প্রয়োজন ছিল ওর? এই অমানুষিক ত্যাগস্বীকারের কোন মূল্যই কি নেই আইনের দৃষ্টিতে?

জ্যাভারের আত্মতৃপ্ত বিবেক হঠাৎ রূঢ় আঘাতে বাস্তবের প্রতি চোখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছে আজ। নতুন সব সমস্যা তার বিচার-বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে ফেলতে চাইছে। খুঁজে পাচ্ছে না কোন সমাধান। যে-লোক দেবতার মত পূজা পাওয়ার যোগ্য, তাকে আইন কেন শৃঙ্খলিত করতে চায়? এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না জ্যাভার। না পেরে নিজের জীবনের প্রতিই তার বিতৃষ্ণা এসে যায় ক্রমশঃ।

একটা জিনিস তার কাছে পরিষ্কার। তার যা কর্তব্য, তা সে করতে পারে নি। আইন সংশোধন করার ভার তার ওপর নেই, আইন অনুযায়ী কাজ করবার দায়িত্ব ছিল তার। সে-দায়িত্ব পালন করতে হলে জাঁ ভ্যালজাঁকে গ্রেফতার করা উচিত ছিল প্রথম সুযোগেই। তা সে করে নি। এখনও জাঁ ভ্যালজাঁকে গ্রেফতার করে আনা যায়, তার বাড়িতে গেলেই। সে পালাবে না বলে কথা দিয়েছে, কথার খেলাপ সে করবে না। হাঁ গ্রেফতার করা যায়, কিন্তু করতে পারছে না জ্যাভার। তার পা চলতে চাইছে না জাঁ ভ্যালজাঁর বাড়ির দিকে।

কর্তব্যভ্রষ্ট এই জীবন নিয়ে জ্যাভার তাহলে করবে কী ?

সীন নদী বয়ে যায় বীচিবিভঙ্গে মন্থর গমনে। সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। হঠাৎ টুপ্ করে সেই মানুষটা জলে পড়ে গেল। আর উঠল না। সংশয়পীড়িত অন্তরের দাহ ঘুচে গেল জ্যাভারের।

* * *

গিলেনরম্যানের আপ্রাণ চেষ্টায় মেরায়াস সুস্থ হয়ে উঠল। একমাত্র স্নেহের দুলালকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরে বৃদ্ধের আনন্দের আর সীমা নেই,—মেরায়াসকে ঢালোয়া অনুমতি দিয়ে দিলেন—"তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর, যাকে খুশী বিবাহ কর—আমি কোন আপত্তি করব না।"

অতএব কোজেতের সঙ্গে মেরায়াসের বিবাহের আর কোন বাধা রইল না। গিলেনরম্যান তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিলেন মেরায়াসকে, জাঁ ভ্যালজাঁ তার যথাসর্বস্ব অর্থাৎ ছয় লক্ষ ফ্র্যাংক দিয়ে দিল কোজেৎকে, পণ্টমার্সি দম্পতি শহরের অন্যতম ধনী পরিবার বলে গণ্য হবে অতঃপর, এতে কোন সন্দেহ রইল না।

প্রাসাদোপম নতুন বাড়ি মেরায়াসের। সেখানে বাস করে মেরায়াস আর কোজেৎ আর এক পল্টন দাসদাসী। মাতামহ গিলেনরম্যান আর পিতা ফকলেভেন্ট সেখানে নিত্য দর্শন দেন।

মেরায়াসের পরিবারে জাঁ ভ্যালজাঁ এখনও ফকলেভেন্ট নামেই পরিচিত।

কিন্তু এ ছলনা চিরদিন চালিয়ে যাওয়া জাঁ ভ্যালজাঁর মনঃপূত নয়। কোজেৎকে সে নিজের পূর্ব-ইতিহাস এ-যাবৎ বলে নি, বললে সে হয়তো সবটা বুঝবে না, যেটুকু বুঝবে তাতে ব্যথাই পাবে শুধু। এই জন্যই বলে নি।

কিন্তু মেরায়াসের কথা আলাদা। জাঁর ওপরে তার গভীর স্নেহ থাকবার কথা নয়। নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি দিয়ে সে জাঁর

কৃতকর্মের ভালমন্দ ওজন করে দেখুক, তারপর জ্যাঁর সঙ্গে কী-রকম সম্পর্ক সে রাখবে, নিজেই স্থির করুক।

প্রথম সুযোগেই জ্যাঁ একদিন অতি গোপনে সব কথা খুলে বলল মেরায়াসকে। অনশনে মৃতপ্রায় কয়েকটি শিশুকে বাঁচাবার জন্য সেই যে রুটি চুরি করা, তাই থেকে শুরু করে বিশপ মীরিয়েলের কাহিনী, ক্ষুদে জার্ভেইয়ের বৃত্তান্ত, ফাতাঁইনের বিয়োগান্ত ইতিহাস, কোজেতের সঙ্গে সম্পর্কটির যথাযথ বিশ্লেষণ—কিছুই বাদ দিল না।

হাঁ, বাদ দিল শুধু একটা জিনিস। চ্যানবেরির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মরণাপন্ন মেরায়াসকে যে সে নিজেই উদ্ধার করে এনেছিল, নিজে পাতালরাজ্যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেও মেরায়াসকে যে সে জীবিত অবস্থায় তার মাতামহের আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছিল—এই একটি কথাই সে গোপন করে গেল। পাছে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার মোহে মেরায়াস বিচারে ভুল করে—এই ভয়েই জ্যাঁ এই পরম প্রয়োজনীয় তথ্যটির উল্লেখমাত্র করল না।

ফলে মেরায়াসের মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সমাজের জীব সে, একটা জেলফেরত দাগী চোর যার পেছনে এখনো পুলিসের গ্রেফতারী পরোয়ানা ঘুরছে—তাকে কেমন করে সে নিজের পারিবারিক গণ্ডীর ভেতর গ্রহণ করবে?

সে মনস্থ করল—জ্যাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, এবং সুযোগমত কোজেৎকে বুঝিয়ে তার ছয় লক্ষ ফ্রাংক যৌতুক ফিরিয়ে দিতে বলবে।

জ্যাঁর আর সমাদর রইল না মেরায়াসের বাড়িতে। দেখা করতে হলে তাকে গিয়ে নীচের ঘরে বসতে হয় এখন। মেরায়াস কোজেৎকে নীচে পাঠিয়ে দেয়, নিজে আসে না জ্যাঁর সামনে। সরলা কোজেৎ অত-শত বোঝে না। তার ভক্তিভালবাসা আগের মতই অক্ষুণ্ণ। তবে স্বামীকেও সে ভালবাসে, তার কথাও বিশ্বাস

করে। মেরায়াস যখন বলে, নীচে নামবার তার সময় নেই বা তার শরীরটা ভাল লাগছে না, সরল বিশ্বাসেই সে-ওজরটাকে সে সত্য বলে মেনে নেয় এবং অসংকোচে বাবাকে এসে সেই কথাই জানায়।

কিন্তু মেরায়াসের মনের ভাবটি জঁা ভ্যালজঁা নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছে। মেরায়াস যে তাকে দূরে রাখতে চায়, তা ও বুঝতে পেরেছে, তবু স্নেহের বন্ধন তো সহজে ছেঁড়া যায় না—অপমান সহ্য করেও সে কোজেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। নিঃসম্পর্কীয় লোকের মত নীচের ঘরেই বসে।

কিন্তু সেই নীচের ঘরেও একদিন দেখা গেল যে আগুন নেই। কোজেৎ বিরক্ত হল, দাসদাসীদের ডেকে ধমক দিতে গেল, কিন্তু তাকে নিষেধ করল জঁা, কোজেৎকে ভোলাল এই বলে যে আগুন ঘরে থাকলে আজকাল তার ভয়ানক গরম লাগে; সে-ই নিষেধ করেছে আগুন রাখতে।

তার পর দিন দেখা গেল আগুনের অভাবের সঙ্গে চেয়ারেরও অভাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জঁাকে দুটো কথা কয়ে আসতে হল কোজেতের সঙ্গে।

এর পর জঁা আর গেল না। অর্থাৎ বাড়ির ভেতরে গেল না। কিন্তু বাড়ির সামনের রাস্তায় রোজ সন্ধ্যার পর তার আনাগোনার বিরাম নেই। জানালার ধারে কোজেৎকে যদি একবারও চকিতের জন্য দেখা যায়! কোনদিন তার আশা পূর্ণ হয়, কোনদিন হয় না। দু চার ঘণ্টা বৃষ্টি-বরফে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে সে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে।

জঁার বয়স হয়েছে। এ অত্যাচার বেশীদিন সইল না। তার লোহার শরীরও ভেঙে পড়ল। অবশেষে এক সন্ধ্যায় সে আর পেরে উঠল না কোজেতের বাড়ির দিকে যেতে। সে শয্যা নিল।

* * *

চোরের প্রয়োজন বড়লোকদের খবর রাখা। হঠাৎ থিনার্ডিয়ার খোঁজ পেলো—শহরে এক নতুন বড়মানুষের আমদানি হয়েছে, নাম তার পন্টমার্সি।

পন্টমার্সি? ওয়াটার্লুর পন্টমার্সির কেউ নয় তো এই লোক? থিনাডিয়ার জোর সন্ধান চালাল।

ফলে অনেক কথাই সে জেনে ফেলল। এই পন্টমার্সি তার সেই পন্টমার্সিরই পুত্র বটে। তা ছাড়া ইদানীং সে বিবাহ করেছে যাকে, সে হল তার ভূতপূর্ব হোটেলের শিশু-পরিচারিকা কোজেৎ।

কোজেতের প্রতিপালক ফকলেভেন্টই যে একটা মৃতপ্রায় লোককে নিয়ে সেদিন সুড়ঙ্গমুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল থিনার্ডিয়ারের সাহায্যে, এ-খবরও অজানা নেই থিনার্ডিয়ারের। কারণ সেদিন সে অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ করেছিল জ্যাভারের গাড়ির। এই বহুবিধ খবর পকেটস্থ করে থিনার্ডিয়ার গিয়ে সাক্ষাৎ চাইল ব্যারন পন্টমার্সির।

মেরায়াস তো অবাক! তার পিতারই ব্যারন উপাধি বোর্বো সরকার স্বীকার করে নি। আজ তাকে ব্যারন বলে সম্বোধন করে কে?

থিনার্ডিয়ার নাম শুনেই সে চমক খেলো, এবং বুঝতেও পারল সব ব্যাপারটা। তার পিতার প্রাণ রক্ষা করেছিল এক থিনার্ডিয়ার ওয়াটার্লু যুদ্ধক্ষেত্রে। এ তাহলে সেই। দু একটা জিজ্ঞাসাবাদেই তার ধারণা সত্য বলে প্রমাণ হল।

মেরায়াস তক্ষুণি পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করল বিশহাজার ফ্রাংক পুরস্কার দিয়ে।

থিনার্ডিয়ার পুলকিত। কিন্তু কোজেতের ওপর তার একটা বদ্ধমূল আক্রোশ আছে সেইদিন থেকে, যেদিন সে একটা অচেনা গুণ্ডার সঙ্গে চলে এসেছিল, তার সেই ভূতপূর্ব সার্জেন্ট হোটেল থেকে।

সে আজ ঝাল ঝাড়বে।

সে বলল—"জানেন ব্যারন, আপনার পত্নীর যে প্রতিপালকটি মসিয়ঁ ফকলেভেন্ট—"

"হাঁ, হাঁ, কী হয়েছে তাঁর?" সাগ্রহে জানতে চায় মেরায়াস।

"চ্যানবেরির যুদ্ধের দিন একটা আধমরা লোককে ঘাড়ে করে ভূগর্ভের সুড়ঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যখন বেরুলো—আমি দেখেছি কি না! বলতে কী—আহত লোকটিকে কিছু শুশ্রূষাও করেছিলাম আমি। ফকলেভেন্ট তার পরিচয় দিল না, কিন্তু আমি তার জামার কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম—ভবিষ্যতে কোন কাজে আসতে পারে এই ভেবে। এই দেখুন সেই কাপড়। আমি ফকলেভেন্টের নামে মিথ্যা কথা বলছি এমন ভাববেন না।"

কাপড়ের টুকরোটা দেখে মেরায়াস স্তম্ভিত। এ যে তারই জামার ছেঁড়া টুকরো একটা! তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে গিয়ে সেই দিনকার জামাটা বার করল। মিলিয়ে দেখল এই ছেঁড়া টুকরোটা ঠিক ঠিক খাপ খেয়ে যাচ্ছে জামার ছিন্ন অংশে।

তাহলে, ফকলেভেন্টই তাকে চ্যানবেরির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন? কই, সেকথা তো তিনি বললেন না? নিজের জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিনি মেরায়াসকে বলতে পারলেন, শুধু বাদ রইল এই একটি কথা? যেটা মেরায়াসের জানার দরকার ছিল সব চাইতে বেশী?

মেরায়াস থিনার্ডিয়ারকে বিদায় দিল এই বলে—"মসিয়ঁ ফকলেভেন্টের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা আমার উচিত, তাই আমি করব, তুমি ভেবো না।"

থিনার্ডিয়ার খুশী হয়ে বেরুলো। মেরায়াসের কথার অর্থ সে বুঝল এই যে ফকলেভেন্টের সঙ্গে অতঃপর সে সেইরকম ব্যবহারই করবে, যেরকম করা উচিত নরঘাতক দস্যুর সঙ্গে।

মেরায়াসের দেওয়া বিশহাজার ফ্রাংক তার পকেটে। আশাতীত অর্থ! সে আর এদেশে থাকল না, কারণ এদেশের পুলিসের বিষ নজর আছে তার ওপরে। সে চলে গেল আমেরিকায়। নিজের চরিত্রের অনুযায়ী একটা ব্যবসা সেখানে সে ফেঁদে বসল—দাস ব্যবসা।

* * *

জাঁ ভ্যালজাঁ মৃত্যুশয্যায়। শিয়রে ছুটি রুপোর মোমদানি। মাঝে মাঝেই সেই ছুটির দিকে সে তাকিয়ে দেখছে পরম সম্ভ্রমের সঙ্গে। মনে হচ্ছে তার—ছুটি মোমদানির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এক জ্যোতির্ময় দেবতা, তিনি বিশপ মীরিয়েল।

কতক্ষণে মীরিয়েলের হাত ধরে সে ভগবানের চরণোপান্তে পৌঁছোতে পারবে—তারই কেবল প্রতীক্ষা করছে সে—

এমন সময়ে কোজেৎকে নিয়ে মেরায়াস সেইখানে প্রবেশ করল। ছুজনেই অনুতপ্ত। কোজেতের অনুতাপ এই কারণে যে স্নেহময় পিতার কোন খবরই সে নেয় নি এতদিন। আর মেরায়াসের? তার অনুতাপের কারণ আরও মর্মান্তিক। জীবনদাতার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে সে।

ক্ষমাপ্রার্থনা, অশ্রুবর্ষণ, তার আর শেষ নেই।

ছুজনকে সস্নেহে আশীর্বাদ করে জাঁ বলল—"আমার আর বিলম্ব নেই। শেষ সময়ে তোমাদের সঙ্গে যে দেখা হল, এতেই বুঝছি—ভগবানের অশেষ দয়া এই ভৃত্যের ওপরে।"

"আপনার জন্য কোন ধর্মযাজক আনি?"—জিজ্ঞাসা করে মেরায়াস।

"ধর্মযাজক! এসেছেন তো। ওই যে!"—হাত দিয়ে মোমদানি ছুটির মাঝখানটা দেখিয়ে দেয় জাঁ। মুখে যেন কী এক জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তার, হয়তো তার অর্থ—"গুরু! আমার যথাসাধ্য

তোমার দেখিয়ে-দেওয়া পথে চলতে চেষ্টা করেছি। তুমি তুষ্ট হয়েছ তো ?”

তারপরই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বুঝি গুরু তাকে বলেছেন, “পুত্র ! নরকুলে তুমি ধন্য। আমি তৃপ্ত হয়েছি পুত্র !”

জঁা ভ্যালজঁার আত্মাকে গ্রহণ করে জ্যোতির্ময় দেবতা ভগবানের চরণোদ্দেশে চলে গেলেন।

—সমাপ্ত—